শ্রীবরদাকুমার পাল

দশ আনা

উপহার

পরমারাধ্যা

মাতৃ-দেবীর

শ্রীচরণে

এই ভ্রমণ-কাহিনীর প্রথম চারি অধ্যায় ১৩৪২ সনের বার্ষিক শিশুসাথীতে 'আফ্রিকার পথে' নামে বাহির হয় এবং শেষ অধ্যায়টি ছাড়া, অবশিষ্ট অধ্যায়গুলি ও ১৩৪২ ও ১৩৪৩ সনের মাসিক শিশুসাথীর কয়েকটি সংখ্যায় বাহির হইয়াছে ; এখন সম্পূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনীটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল।

সূচী

পিগ্‌মী-নৃত্য

এক

বোম্বাইর পথে

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর দেখিতে দেখিতে দশটি মাস কাটিয়া গেল। অন্য কিছু পড়ারও কোন সুবিধা হইল না, কোন কাজকর্ম্মেও মন বসিতেছিল না। অথচ সময়টা ঐ ভাবে বিনা কাজে কাটাইয়া দেওয়ার ইচ্ছাও আমার ছিল না।

কোন একটা নূতন দেশে ভ্রমণ করিবার প্রবল ইচ্ছা অনেকদিন যাবত মনের কোণে পোষণ করিতেছিলাম;

সৌভাগ্যক্রমে একটা সুযোগও জুটিয়া গেল। কারণ, সেই সময়ই বিশুমামা আফ্রিকা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমাকে তাঁহার সঙ্গে নেওয়ার জন্য ধরিয়া বসিলাম। মামার কাছে ভাগিনেয়ের আব্‌দার; কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

মামাবাবু পূর্ব্ব-আফ্রিকার অন্তর্গত কেনিয়া উপনিবেশের রাজধানী **নাইরোবি** সহরে একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। তাঁহার পূরা নাম বিশ্বনাথ রায়, কিন্তু তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠগণ তাঁহাকে ডাকেন 'বিশু'; আর তাঁহার কার্য্যস্থানে তিনি 'বি. এন. রায়' নামেই পরিচিত।

মাতাপিতা বা আত্মীয়গণের ইচ্ছা অনুসারেই সন্তানের নামকরণ হয়; তথাপি কাহারও কাহারও নামকরণের একটা ছোটখাট ইতিহাস থাকে। বিশুমামার নামেরও তেমন একটা ইতিহাস আছে।

বিশুমামা—দাদা-মশায় ও দিদিমার প্রথম সন্তান। শুনিয়াছি বেশি বয়স পর্য্যন্ত দিদিমার কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে নিয়া কাশীধামে গিয়াছিলেন। কাশী-বিশ্বনাথের প্রসাদ নেওয়ার পর বৎসরই মামাবাবুর জন্ম হয়। মামাবাবুর জন্ম হইয়াছিল মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে, আর সেই দিনটাও নাকি ছিল বৃহস্পতিবার। বিশ্বেশ্বরের দান বলিয়াই মামাবাবুর নাম হইল—বিশ্বনাথ; পরন্তু বিশ্বনাথ

শব্দের অপভ্রংশ, অথবা বিষুব-সংক্রান্তিতে বা বৃহস্পতিবারে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার ডাক-নাম হয় 'বিশু'।

* * * *

দুই-চারি দিনের মধ্যে বিদেশ-যাত্রার আয়োজন-পর্ব্ব শেষ
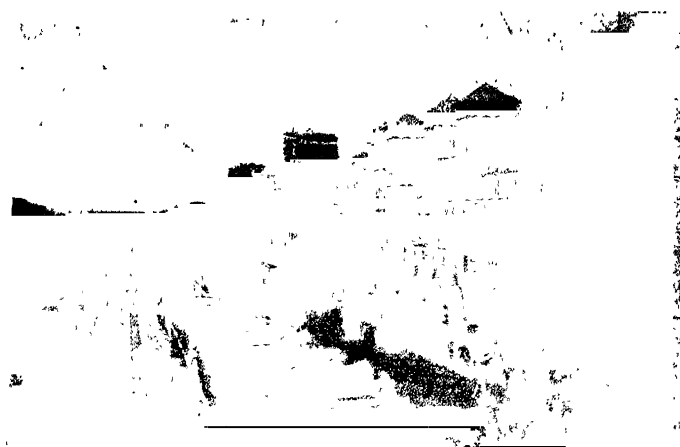
হাওড়া ষ্টেশন

হইল। দাদা-মশায়ের কলিকাতার বাসায়—মামার শ্বশুর, ছোট মেসো প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন অনেকেই জড় হইয়াছেন।

বিদেশ-যাত্রার দিন আসিয়া পড়িল। বেলা পাঁচটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক্ অন্ধকার হইতে লাগিল—সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। বাসায় খাওয়া দাওয়ার কার্য্য খুব

তাড়াতাড়িই শেষ হইয়া গেল। মা, মাসীমা ও দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন। আমার কিন্তু সেই সব মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সবাইকে প্রণাম করিয়া মোটরে গিয়া বসিলাম। রাত্র সাড়ে সাতটার সময় হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে আমরা রওনা হইলাম। আমাদিগকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইবার জন্য প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণের অনেকেই ষ্টেশনে গেলেন।

গুরুজনদিগের পদধূলি লইয়া এবং কনিষ্ঠ সবাইকে স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইয়া, আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। রাত্র সাড়ে আটটার পরে, বিকট বংশীধ্বনি ও ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া—ই. আই. আর. বোম্বে মেইল হাওড়া ষ্টেশন ছাড়িয়া ছুটিল। কলিকাতা হইতে একেবারে জলপথেও **মোম্বাসা** হইয়া নাইরোবি যাওয়া যায় ; আমরা কিন্তু বোম্বাইর পথে চলিলাম।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া—হুস্ হুস্ শব্দে বিরাটকায় লৌহ-দানব অসংখ্য লোকজন ও জিনিষপত্র বহন করিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। যতক্ষণ না ঘুম আসিল, ততক্ষণ জানালার পাশে বসিয়া রহিলাম। রেলপথের দুই পাশে গাছপালা, বাড়ীঘর চোখের পলক ফেলিতে না-ফেলিতে —যেন দৌড়িয়া পিছন দিকে সরিয়া যাইতেছে। খানিক পরে পরে দেখিলাম, ছোট ছোট ষ্টেশনের যাত্রীরা আমাদের গাড়ীর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে ; আর, সিগ্‌নলার নীল আলো দেখাইয়া লাইন ক্লিয়ার আছে বুঝাইয়া দিতেছেন। এই সব

ষ্টেশনের কাছে এক একটা কর্কশ বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ী সবেগে চলিয়া যাইতেছে। কতক্ষণ এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম ; মামাবাবু আগেই ঘুমাইয়াছিলেন।

সকাল সাতটার সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিল। বুঝিলাম সবে মাত্র ভোর হইয়াছে। ক্রমে চারিদিক্ পরিষ্কার হইতেছে। কুয়াশাজাল ভেদ করিয়া তরুণ সূর্য্যের স্নিগ্ধ আলো উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উঠিয়া দেখি গাড়ী কোন্ একটা ষ্টেশনে থামিয়া আছে ; আর, মামাবাবু একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ ষ্টেশনের নাম মোগলসরাই জংশন। ঐ ষ্টেশনে মামাবাবুর এক বন্ধু আমাদের সঙ্গী হইবেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই ঠিক ছিল। বুঝিলাম মামাবাবু যাঁহার সহিত আলাপ করিতেছেন উনিই তাঁহার বন্ধু ; কোনও একটা বিশেষ কারণে তিনি আমাদের সহযাত্রী হইতে পারিলেন না। আমার পরিচয় জানিয়া তিনি আমাকে খুবই আদর করিলেন এবং কতকগুলি খাবার কিনিয়া আমার হাতে দিলেন। কয়েক মিনিট পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

হাতমুখ ধুইয়া আমরা চা ও খাবার খাইলাম। তারপর জানালার ধারে বসিয়া, আমি রাস্তার পাশের দৃশ্য সমূহ দেখিতে লাগিলাম। বেলা এগারটায় আবার কিছু আহার করিয়া একখানা মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়া শুইয়া পড়িলাম ; কিন্তু

দোলায়মান গাড়ীতে শুইয়া, পড়িতে পারিলাম না কিছুই। পত্রিকাখানা বুকের উপর রাখিয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি বলিতে পারি না। অপরাহ্ণ তিনটার পরে ঘুম ভাঙ্গিলে মামাবাবু বলিলেন,—"কি বাবা, ঘুমে যে দেখ্‌চি কুম্ভকর্ণকেও হার মানাতে ব'সেছ! এমন ধারা শোয়া বসায় কিন্তু আমাদের কাট্‌তে হবে অনেক দিন।"

আমি সে-সব কথায় কান দিলাম না; বলিলাম,—"এখন গাড়ী কোন্ দিক্ পানে যাচ্ছে মামাবাবু?"

মামাবাবু বলিলেন,—"গাড়ী এখন ই. আই. আর. লাইন ছেড়ে জি. আই. পি. রেল লাইন ধ'রে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চ'লেছে। একটু পরেই জব্বলপুরে গাড়ী থাম্‌বে।"

জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশের একটি প্রধান সহর। যখন জব্বলপুরে গাড়ী থামিল, তখন বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন—তাহাতেই শীত-কালের নাতিদীর্ঘ দিবাভাগের অবসান সূচিত হইতেছিল। অদূরে প্রসিদ্ধ মর্ম্মরপর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ম্লান রশ্মি পর্ব্বতগাত্রে পতিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তন্ময় হইয়া সেই সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিতেছিলাম; অমনি বিকট শব্দ করিয়া বাষ্পীয় লৌহ-দানব সেই মনোরম দৃশ্য পিছনে ফেলিয়া গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিল।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে সারা পৃথিবী ডুবিয়া [illegible]

জানালার পাশে বসিয়া থাকিতে আর ইচ্ছা হইল না। যেই দেশ দেখিতে যাইতেছি তাহার সম্বন্ধে মামাবাবুকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রকৃতির শোভা এবং পশ্চিম ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি দেখিতেছিলাম। ক্রমেই রেলা
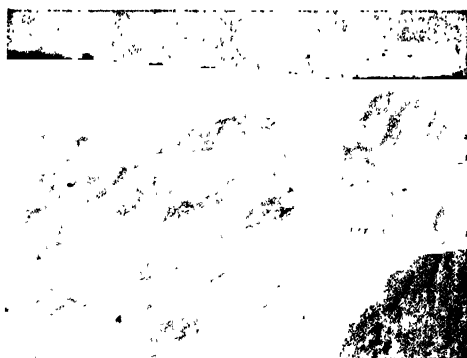
মর্ম্মর পর্ব্বত—জব্বলপুর

বাড়িয়া উঠিল। মামাবাবু আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"আর দু' চারিটা ষ্টেশনের পরেই আমরা বোম্বাই এসে পড়্ব।"

বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় বোম্বাই সহরের ভিক্টোরিয়া টার্‌মিনাস্ ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। অসংখ্য কৌতূহলী লোক-জনে ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরম ভরপূর—বাহিরে যান-বাহনের হট্টগোল। সকলেই বাহির হইয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে যাইতে

ব্যস্ত। একাধারে প্রায় সাঁইত্রিশ ঘণ্টা কাল গাড়ীতে শুইয়া বসিয়া যাত্রীদের শরীরের ও মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করা হয়ত অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। এই সাঁইত্রিশ ঘণ্টায় আমরা কলিকাতা হইতে ১৩৫০ মাইল দূরে—ভারতের পশ্চিম-সীমান্তবর্ত্তী সমুদ্রতীরে পৌঁছিলাম।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ ষ্টেশন

উপকূল-সংলগ্ন একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর বোম্বাই সহর। উহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাজধানী। আয়তনে এবং লোক-সংখ্যায় উহা কলিকাতার সমকক্ষ হইবে না; কিন্তু ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল—বোম্বাই সহর। ঐস্থানের সারি সারি কাপড়ের কল দেখিয়া বিস্মিত হইতে

হয়। উহার পোতাশ্রয়টিও বেশ্ সুন্দর। আমরা কয়েকদিন বোম্বাই সহরে অবস্থান করিলাম। মামাবাবুর এক নিকট-

বোম্বাই সহরের একটি রাজপথ

আত্মীয় সেখানে ব্যবসায় করেন ; কাজেই থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধাই আমাদের ছিল না।

দুই

সমুদ্র-বক্ষে

কয়েকদিন পরে আমরা মোম্বাসা-গামী জাহাজে আরোহণ করিলাম। জাহাজে উঠিবার এক ঘণ্টা আগে ডাক্তার আসিয়া আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অপরাহ্ণ ৪টার সময়, আলেক্‌জান্দ্রা ডক্ হইতে জাহাজ ছাড়িল। আমাদের সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সুরু হইল।

আমরা যে জাহাজে রওনা হইলাম, তাহাকে ছোটখাট একটা ভাসমান নগরী বলা যাইতে পারে। উহাতে আধুনিক সভ্য জগতের নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রায় কোন জিনিষেরই অভাব দেখি নাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন—বাঙ্গালী, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, ভাটিয়া প্রভৃতি ছাড়া, বহু ইউরোপীয় সাহেব—কেহ একাকী, কেহ বা সপরিবারে আমাদের সহযাত্রী হইয়া চলিয়াছেন। কেহ আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া যাইতেছেন—আবার কেহ বা আপন জনের সঙ্গে
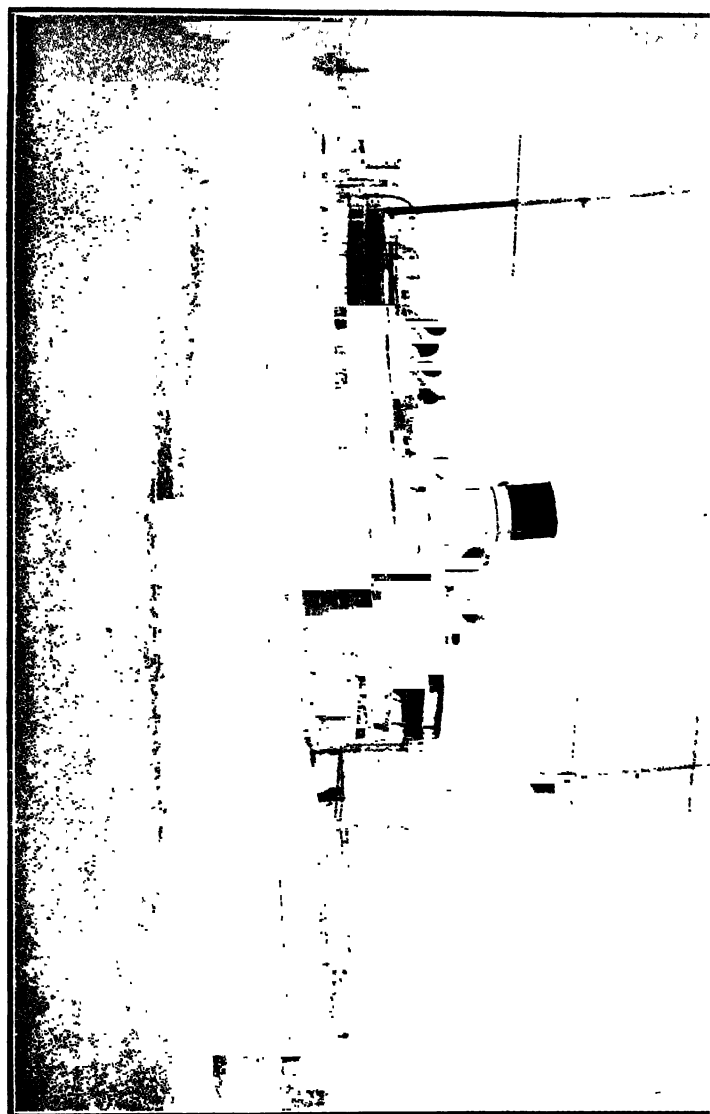
মিলিত হইবার আশায় চলিয়াছেন। কাজেই যাত্রীদের বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে—হর্ষ ও বিষাদের অপূর্ব্ব মিলন-দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা কেবিনের দিকে অগ্রসর হইলাম। কেবিনে প্রবেশ করিয়া আমাদের জিনিষপত্র সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিলাম; কারণ কমপক্ষে দশদিন আমাদিগকে সেই কক্ষেই কাটাইতে হইবে।

নীল সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি মথিত করিয়া আমাদের জাহাজ অবিশ্রান্তভাবে চলিয়াছে—জাহাজের গতির এতটুকু তারতম্য বুঝা যাইতেছে না। কতক সময় পরে পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখিলাম—ভারতের উপকূলভাগের দৃশ্য কালো রেখার মত প্রতীয়মান হইল, আর কোন দিকে কিছুই দেখা গেল না; চারিদিকেই কেবল জল আর জল—নীল জলরাশির যেন আর শেষ নাই! জাহাজের আশে পাশে নানা জাতীয় সামুদ্রিক পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে;—কখনও উড়িয়া বহুদূরে চলিয়া যাইতেছে, কখনও বা আসিয়া জাহাজের ছাদে, মাস্তুলে বা ধূমনালীর ধারে বসিতেছে। আরও কিছুক্ষণ পরে সূর্য্যাস্ত হইল।

সমুদ্রে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের দৃশ্য দেখিলে বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-মাহাত্ম্যের কথা স্বতঃই মনে জাগিয়া উঠে। প্রভাতে পূর্ব্ব গগন লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া—যেন হঠাৎ অতল জলরাশির ভিতর হইতে সূর্য্যদেব আকাশে উদিত হ'ন;

সূর্য্যের সেই সময়ের স্নিগ্ধ রশ্মি দেখিয়া কাহারও কি মনে হয় যে, এই রশ্মির প্রচণ্ড শক্তিতে মধ্যাহ্নে জীবকুল অতিষ্ঠ হইয়া পড়িবে? সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য্য অস্তাচলে গমন করেন, তখন আর এক অভিনব দৃশ্য নয়নগোচর হয়। পশ্চিম আকাশ লোহিত, হরিৎ, পাটল প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণে শোভিত হয়, আর সূর্য্যদেব যেন সেই রঙের সমুদ্রে অবগাহন-ছলে বারিধির কোলে ঢলিয়া পড়েন! আমি প্রায় প্রত্যহ সকালে ও বিকালে—পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্-চক্রবালে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতাম।

একঘেয়ে জীবন কাহারই ভাল লাগে না। আমরা মাঝে মাঝে নানা রকম খেলায় সময় কাটাইতাম;, ক্যারম্-বোর্ড, পিং-পং প্রভৃতি খেলায় বেশ আমোদের সহিত সময় কাটিত। তখন খেলার সাথীর অভাব মোটেই ছিল না। দেশে থাকিতে অমুকে বাঙ্গালী, অমুকে উড়িয়া এই ধরণের একটা সংকীর্ণ ভাব আমাদের ভিতর দেখা যায়, কিন্তু যেই আমরা দেশ ছাড়িলাম, অম্নি সব বিভিন্নতা—সব সংকীর্ণতা ঘুচিয়া যায়; তখন সবাইকে একদেশবাসী বলিয়া মনে করি—তখন আমাদের সাধারণ সংজ্ঞা হয় 'ভারতবাসী'। কাজেই সকলে মিলিয়া মিশিয়া খেলাধূলা করিতে বা গান-বাজনা করিতে তখন আর কোন প্রতিবন্ধকই থাকে না।

মাঝে মাঝে মামাবাবু তাঁহার গ্রামোফোনটি বাহির করিয়া

বসিতেন। আর দেখিতে দেখিতে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন বয়সী যাত্রী চারিদিকে ঘিরিয়া বসিত।

মামাবাবুর নামের সামান্য ইতিহাসটুকু হইতেই বুঝা গিয়াছে যে, তাঁহারা শিব-শক্তির উপাসক। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও দেব-দেবীর প্রতি মামাবাবুর অগাধ ভক্তি। তিনি শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত—বিশেষতঃ রাম-প্রসাদের গান খুবই ভালবাসিতেন; প্রায়ই তিনি "মা আমায় ঘুরাবি কত—কলুর চোখবাঁধা বলদের মত" এই গানের রেকর্ডখানা গ্রামোফোনে জুড়িয়া দিতেন। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বেশিবয়সী ভদ্রলোক ছিলেন; তিনি তন্ময় হইয়া এই গানটি শুনিতেন—সময় সময় তাঁহার গণ্ড বাহিয়া দুই-এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেও দেখিয়াছি।

এইভাবে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদে দিনগুলি কাটিতে লাগিল। বোম্বাই ছাড়িবার পাঁচদিন পরে একদা দেখিলাম, জাহাজ এক বন্দরে আসিয়া থামিয়াছে। জনৈক সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—ঐ বন্দরের নাম ভিক্টোরিয়া; উহা সেশেলিস্ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এবং বোম্বাই হইতে ১,৭৭২ মাইল দূরে।

নব্বইটি ছোট-বড় দ্বীপ মিলিত হইয়া ঐ দ্বীপশ্রেণী গঠিত; তাহাদের মধ্যে মাহে নামক দ্বীপটি বৃহত্তম। তাহার উপকূলেই ভিক্টোরিয়া বন্দর। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে যত লোক

আছে, তাহার পাঁচ-ভাগের চারি-ভাগ মাহে দ্বীপে বাস করে। ঐ দ্বীপের দৈর্ঘ্য ১৭ মাইল, প্রস্থ কোথায়ও চারি মাইল, কোথায়ও বা সাত মাইল।

কথিত আছে, জনৈক পর্ত্তুগীজ নাবিক ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দ্বীপশ্রেণী আবিষ্কার করেন। তখন ঐ সব স্থানে জলদস্যুর আড্ডা ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে দ্বীপগুলি ফরাসীদের অধীন হয় এবং আরও বায়ান্ন বৎসর পরে—১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ জাতি উহাদের কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। সমগ্র দ্বীপশ্রেণীর পরিমাণ-ফল প্রায় ১৫০ বর্গ মাইল।

আমাদের দেশের দক্ষিণস্থিত ভারত মহাসাগর আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। আফ্রিকার মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, মাদাগাস্কার নামে একটি বৃহৎ দ্বীপ ভারত মহাসাগরের বুকে ভাসিয়া আছে। সেশেলিস্ দ্বীপপুঞ্জ মাদাগাস্কারের বহু উত্তরে অবস্থিত।

সেশেলিস্ দ্বীপশ্রেণী পিছনে ফেলিবার পর, জাহাজ সোজা পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল এবং বোম্বাই হইতে রওনা হওয়ার দশম দিন খুব ভোরে পশ্চিম-দিগন্তে কালো রেখার ন্যায় আফ্রিকার উপকূল-ভাগ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

জাহাজ তীরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলে আমার প্রাণে যে কেমন আনন্দ হইতেছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। বহুদিন অনির্দ্দিষ্টভাবে আট্লাণ্টিক পাড়ি দিয়া—

অবশেষে আমেরিকার উপকূলের নিকটবর্ত্তী জলমধ্যে বৃক্ষপতিত পাখীর বাসা ও শুষ্ক বৃক্ষশাখা ভাসিতে দেখিয়া, নাবিক কলম্বসের নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হইয়াছিল। কলম্বসের তৎকালীন আনন্দটুকু যিনি কল্পনা করিতে পারেন, কেবলমাত্র তিনিই আমার আনন্দের পরিমাণ বুঝিতে সমর্থ।

জাহাজ মোম্বাসা বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইলে মামাবাবু বলিলেন যে, এই কয়দিনে আমরা জলপথে প্রায় আটাইশ শত মাইল ভ্রমণ করিয়াছি। বোম্বাই হইতে রওনা হওয়ার পর সেশেলিস্ দ্বীপের দিকে না যাইয়া—জাহাজ সোজা মোম্বাসায় পৌঁছিলে পথের দৈর্ঘ্য হইত ২,৩৯০ মাইল।

কলিকাতা হইতে এখন আমরা প্রায় চারি হাজার মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি—চিন্তা করিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

তিন

মোম্বাসা সহরে

বোম্বাইর ন্যায় মোম্বাসা বন্দরও উপকূল-সংলগ্ন একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থিত। দ্বীপটি মাত্র তিন মাইল লম্বা এবং দুই মাইল চওড়া।

দ্বীপের পূর্ব্ব কূলে মোম্বাসা ডক এবং পশ্চিম কূলে কিলিন্দিনি ডক। বিকট বংশীধ্বনি করিয়া ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে জাহাজ কিলিন্দিনি ডকে প্রবেশ করিল। যাত্রীরা একে একে অবতরণ করিতে লাগিল। আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের দুই-চারিজন ডকে ঘূরাফিরি করিতেছিল; তাহাদের গায়ে অদ্ভুত পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিলাম।

আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতি বাস করে। উত্তর-ভাগে—সাহারা মরুভূমির উত্তরে আরব ও বার্ব্বার জাতি বাস করে; তাহারা নাকি আর্য্যবংশ-সম্ভূত। সাহারার দক্ষিণে কৃষ্ণকায় নিগ্রো বা কাফ্রি জাতির বাস। কাফ্রিরা আবার জুলু, বাণ্টু প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। মধ্য-আফ্রিকার গহন বনে, আড়াই হাত হইতে তিন হাত দীর্ঘ একপ্রকার খর্ব্বকায় কাফ্রি বাস করে—তাহারা পিগমী নামে প্রসিদ্ধ। কালাহারি

মরুভূমির নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় যে সব কাফ্রি বাস করে তাহারা সাধারণতঃ বাণ্টু-নিগ্রো নামে পরিচিত।

কিছুদিন পরে মামাবাবুর কাছে শুনিয়াছিলাম, পশ্চিম আফ্রিকায় লিওপার্ডম্যান নামে এক অসভ্য জাতি বাস করে;
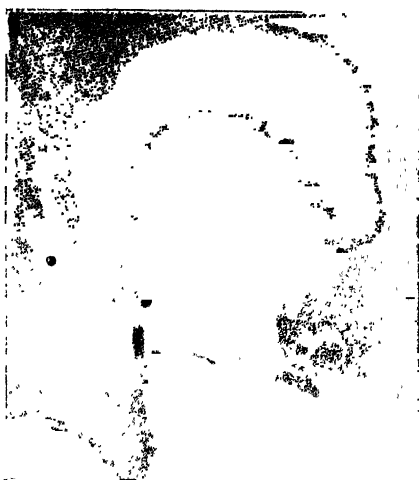
কাফ্রি পুরুষ

তাহারা নাকি ভয়ানক হিংস্রপ্রকৃতি। সুখের বিষয়—তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাহারা শুধু পশ্চিম আফ্রিকায় থাকে না—মাঝে মাঝে আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলেও তাহাদের দুই-একজনকে দেখা যায়; এসব অধিবাসী ছাড়া, উপনিবেশ-

সমূহে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অনেক লোক স্থায়িভাবে বসবাস করে।

কিলিন্‌দিনি ডকে অবতরণ করিয়া আমরা মোটর-যোগে

লিওপার্ডম্যান

এক হোটেলে আশ্রয় লইলাম। মোম্বাসা সহরে আমরা দুইদিন ছিলাম। সেই দুইদিনে কতক সময় মোটর-বোটে এবং কতক সময় মোটর-কারে চড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া

অনেক কিছু দেখিলাম। হাইকোর্ট, যোসেফ্ ফোর্ট নামক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, লাইট হাউস, নূতন দুর্গ, গীর্জ্জা, গবর্ণমেণ্ট হাউস, বড় পোষ্ট-আফিস প্রভৃতি দেখিবার পর, আমরা আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের পল্লী ও কাফ্রি-পল্লীতে গিয়াছিলাম।

সেই সময়ে তথাকার কাফ্রিদের কি একটা উৎসব ছিল। কাফ্রিদের উৎসবের সাজসজ্জাও অপরূপ। সেই উৎসব

মাসাই নটীদের নৃত্য

উপলক্ষে একদল মাসাই জাতীয় নটীর নৃত্যগীত হইতেছিল। তাহাদের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীগুলিই দেখিলাম, গানের একটা পদও বুঝিতে পারি নাই—এমনই অদ্ভুত তাহাদের ভাষা। মোম্বাসা পৌঁছিবার পরে মামাবাবুর একজন কাফ্রি মক্কেলের সহিত সাক্ষাৎ হয়; লোকটি বেশ শিক্ষিত ও উন্নত।

ঐ লোকটিও উক্ত দুইদিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল; সেই জন্যই কাফ্রিদের পল্লীতে বেড়াইবার সুযোগ হইয়াছিল।

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকা—প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমি! অভিনব জন্তু-জানোয়ারে পরিপূর্ণ সুবিশাল অরণ্যানী, জন-মানবের বসতিশূন্য সহস্র সহস্র যোজন-ব্যাপী বালি-কঙ্করময় দুস্তর মরুপ্রান্তর, উত্তাল-তরঙ্গময়ী স্রোতস্বিনী, সুবিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল সমতলক্ষেত্র, সু-উচ্চ প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান দুরারোহ মালভূমি—প্রকৃতির এত সব বিচিত্র দৃশ্যের একত্র সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই বিচিত্র ভূ-খণ্ডের পূর্ব্বপ্রান্ত জুড়িয়া কেনিয়া উপনিবেশ।

এখন যাহাকে কেনিয়া উপনিবেশ বলে, তাহারই পূর্ব্ব নাম ছিল ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকা এবং তৎকালে মোম্বাসা সহরই ছিল উহার রাজধানী। বিভিন্ন জাতির মিলন-ক্ষেত্র, প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলাভূমি আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব্বদিকের প্রবেশ-দ্বার এই মোম্বাসা সহরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাহাজসমূহ যাতায়াত করে এবং ঐ স্থান হইতে কেনিয়া-উগাণ্ডা রেলওয়ে আরম্ভ হওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আমার প্রায়ই মনে হইত আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশ ইউরোপীয় জাতিরা দখল করিয়া আছে কেন? বোম্বাই হইতে রওনা হওয়ার পর, একদিন মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমার এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি বলেন,—আফ্রিকার উত্তরে সুবিশাল সাহারা মরু। উহা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে যাওয়া দুঃসাধ্য। তাহা ছাড়া আফ্রিকার উপকূলভাগ নেহাৎ অস্বাস্থ্যকর ও জঙ্গলময় এবং তাহার পরেই সু-উচ্চ মালভূমিসমূহ প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান। নদীগুলিও তরঙ্গসঙ্কুল—সেই সব নদী বাহিয়া দেশের অভ্যন্তর-ভাগে যাওয়া কষ্টকর। এই সব নানা কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী আফ্রিকা-বাসীদের অন্য দেশের সহিত প্রায় কোন সম্বন্ধই ছিল না। বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় তাহারা বর্ব্বর ও অসভ্য রহিয়া গেল।

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা যখন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘূরিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিলেন, তখনই আফ্রিকার দক্ষিণ অংশের বিবরণ এশিয়া ও ইউরোপবাসীরা জানিতে পারিল। তারপর ডাক্তার লিভিংষ্টোন-প্রমুখ মহাপ্রাণ আবিষ্কারকগণ প্রায় একশ' বৎসর আগে, দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরের সবিশেষ বিবরণ সভ্যজগতে প্রচার করেন। তখন হইতেই ইউরোপীয় জাতিসমূহ ধর্ম্মপ্রচার ও বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে—দলে দলে আফ্রিকায় গমন করে এবং স্ব স্ব সুবিধা-অনুযায়ী স্থানসমূহ দখল করিয়া লয়।

মিশরীয় সুদান, ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড, কেনিয়া উপনিবেশ বা ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকা, ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা-ইউনিয়ন, ব্রিটিশ পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি রাজ্যসমূহ ক্রমে ক্রমে

ইংরেজ জাতির অধিকারে আসে। ব্রিটিশ-অধিকৃত রাজ্য ও উপনিবেশগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ কেনিয়া; উহারই রাজধানী নাইরোবি সহর আমাদের গন্তব্যস্থল।

পূর্ব্বকথিত কেনিয়া-উগাণ্ডা রেলওয়ে তৈয়ারীর সময়ে, ভারত গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, বহু ভারতবাসীকে কেনিয়ায় প্রেরণ করেন। তাহাদের অনেকেই কেনিয়া উপনিবেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন।

ভারতীয়দের কেহ কেহ সেখানে বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন এবং নিজেদের জমিতে কাফি, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন করিতেছেন। কেহ কেহ আইন বা চিকিৎসা ব্যবসায় করেন; আবার অন্যান্যেরা হয়ত পণ্যদ্রব্যাদি আমদানী-রপ্তানীর কাজে লিপ্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন।

ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান
আবিসিনিয়া
কাইরো
নাইরোবি
মোম্বাসা
বিষুব রেখা
ভিক্টোরিয়া প্রপাত
কেপ টাউন
য়্যালবার্ট হ্রদ
কিয়োগা হ্রদ
নমসাগলি
এলগান পঃ
কিটেল
এলডোরেট
টমসন প্রপাত
মাউন্ট কেনিয়া
ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড
ফোর্ট পোর্টেল
কাম্পালা
জিঞ্জা
এনটেবি
কিসুমু
নকুরু
নাইবাসা
ন্যারি
নাইরোবি
এড্‌ওয়ার্ড হ্রদ
বুকোবা
ভিক্টোরিয়া হ্রদ
মুসোমা
মাগাডি হ্রদ
কাজিয়াডো
সিরেঙ্গটি প্রান্তর
মোয়াঞ্জা
গোরোঙ্গোরো
মাউন্ট মেরু
কিলিমানজারো পর্ব্বত
ভোই
মোম্বাসা
আরুশা
মোশি
টাঙ্গা
ট্যাঙ্গানিকা
পথ
রেলপথ
সীমা
ইংরাজী মাইল
০ ৫০ ১০০ ২০০

চার
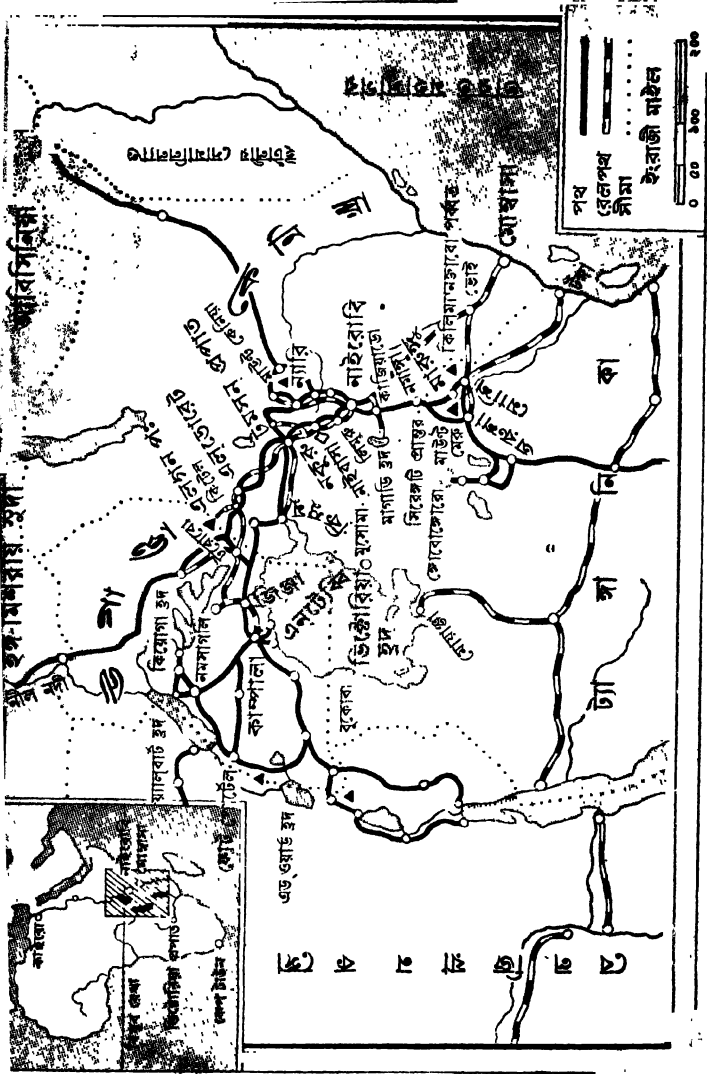
নাইরোবি অভিমুখে

দুইদিন মোম্বাসা সহরে অবস্থান করিয়া তৃতীয় দিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় আমরা ট্রেনে উঠিলাম। মোম্বাসা সেতু পার হইয়া ট্রেন আস্তে আস্তে মহাদেশের অভ্যন্তরের দিকে রওনা হইল। রেল লাইনের দুইদিকে আম, নারিকেল ও পাম্ গাছ ছাড়া গ্রীষ্মমণ্ডলে উৎপন্ন হয়—এমন সব ফলের গাছ দৃষ্টিগোচর হইল। স্থানে স্থানে ধান, ইক্ষু, ভুট্টা, কার্পাস, কাফি ও তামাকের ক্ষেত এবং তাহাদের মাঝে মাঝে তৃণাচ্ছাদিত মাঠ সমূহে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু চরিতে দেখা গেল।

রাত্র প্রায় সাড়ে নয়টার সময় ট্রেন **ভোই** নামক ষ্টেশনে থামিল। ঐ ষ্টেশন মোম্বাসা হইতে ১০৪ মাইল দূরবর্ত্তী। ষ্টেশনটি বেশ বড়। সেখান হইতে একটি শাখা লাইন আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত—**কিলিম্যানজারোর** পার্শ্ব দিয়া **অরুশা** পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নাইরোবি সহরে অবস্থানকালে আমি একবার কিলিম্যানজারো পর্ব্বত দেখিতে গিয়াছিলাম।

ভোই ষ্টেশন পিছনে ফেলিয়া ট্রেন নাইরোবির দিকে রওনা হইলে, আমরা শুইয়া পড়িলাম। গাড়ীতে রাত্রে শোওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। রাত্রিকাল বলিয়া চারিদিকের দৃশ্যাবলি দেখিতে পারিলাম না; তথাপি ট্রেনের গতিতে বুঝিতে পারিলাম উহা যেন আঁকিয়া বাঁকিয়া—বারংবার মোড় ফিরিয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতেছে।

মামাবাবুকে গাড়ীর ঐরূপ বিচিত্র গতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"ট্রেন ক্রমশঃ মালভূমি অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে। এ অঞ্চল উপকূল থেকে চার হাজার ফুট উঁচু। এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর, আর এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ও সূর্য্যোত্তাপ খুব বেশিও নয়—নেহাৎ কমও নয়। এই অভিনব জলবায়ুতে কত রকম জন্তু-জানোয়ার স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে, রাত ভোর হ'লেই তা' তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

মামাবাবুর কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল এতই বাড়িয়া গেল যে, মানসিক চাঞ্চল্যের ফলে সে-রাত্রে আর ভাল ঘুম হইল না। রাত্র প্রভাত হইতে না-হইতে আমি উঠিয়া বসিলাম। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে, মামাবাবু উঠিতে বারংবার নিষেধ করিতেছিলেন; কিন্তু আমার মন মানিল না, গরম জামা-কাপড় জড়াইয়া জানালার ধারে বসিলাম। প্রভাতের শীতল বায়ুর স্পর্শে শরীর ও মন সতেজ হইয়া উঠিল।

গাড়ী অবিরামগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। লাইনের পাশে

কোথায়ও ঝোপ-জঙ্গল—কোথায়ও কৃষিক্ষেত্র আর তারই মাঝে মাঝে বাণ্টু কাফ্রিদের অপরূপ কুটীর।

এসব দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। দিনের আলো সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কতক্ষণ পরে দেখি উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে বসিয়া দুইটি কাফ্রি-শিশু উৎসুকদৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে; তাহাদের হাতে এবং আশে পাশে কয়েকটি

কাফ্রি-শিশু ও উটপাখীর ডিম

চালকুমড়ো রহিয়াছে। শিশু দুইটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মামাবাবুকে বলিলাম,—"দেখুন দেখুন মামাবাবু, ছেলে দুটি কুম্‌ড়ো নিয়ে কেমন খেল্‌ছে!"

মামাবাবু হাসিয়া জবাব দিলেন,—"আরে ওগুলো কুম্‌ড়ো নয়—উটপাখীর ডিম। উটপাখীর ডিম সংগ্রহ করা কিন্তু নেহাৎ সোজা কাজ নয়। কারণ উটপাখীরা এমন হিংস্রুটে

যে, ওদের কেউ আক্রমণ কর্‌লে, ওরা পালাবার আগেই ডিমগুলোকে ভেঙ্গে চূরে রেখে যায়। ছেলেদের হাতের ডিমগুলো হয়তো পোষা পাখীর ডিম। এদেশের অনেক

জেব্রা ও ওরিক্‌স্‌

জায়গায় উটপাখী পালন করা হয়। উটপাখীর পালক ইউরোপীয় মহিলাদের একটা বিলাসের সামগ্রী—তা বোধ হয়

তুমি জান; উটপাখীর পালক বিদেশে চালান দিয়ে এদেশের লোকেরা হাজার হাজার টাকা রোজগার করে।"

এ সব কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গাড়ী কোন্ একটা ষ্টেশনে থামিয়া পড়িল। মেইল ট্রেন ঐ ষ্টেশনে থামে না। লাইন ক্লিয়ার ছিল না বলিয়া গাড়ী থামিয়া পড়িলে মামাবাবু বলিলেন,—"ঐ দেখ একটা খোয়াড়ের ভিতর কত-গুলো জানোয়ার র'য়েছে। ওগুলোর মধ্যে যাদের গায়ে কালো কালো ডোরা, তাদের বলে জেব্রা। কলিকাতার চিড়িয়া-খানায় তুমি নিশ্চয়ই জেব্রা দেখেছ। আর লম্বা শিংওয়ালা জানোয়ারগুলো এক জাতীয় হরিণ—ওদের নাম ওরিক্স (Oryx); উত্তর-কেনিয়াতে এ সব জন্তু বেশি দেখা যায়।"

মামাবাবুর কথা শেষ হইতে না-হইতে গাড়ী ছাড়িয়া

জিরাফ

দিয়াছে। গাড়ী আরও কতদূর অগ্রসর হইলে বামদিকে দেখিলাম কয়েক দল জিরাফ, উটপাখী ও এক জাতীয় কৃষ্ণসার

মৃগ চরিয়া বেড়াইতেছে। জিরাফেরা লম্বা গলা বাড়াইয়া গাছের ডালপালা ভাঙ্গিতেছে, কৃষ্ণসারগুলি কচি কচি ঘাস খাইতেছে—আর উটপাখী-গুলি ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

উটপাখী

জানোয়ারগুলির ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল—গাড়ীর বিকট শব্দে তাঁহাদের মোটেই শান্তিভঙ্গ হইতেছে না। তাহারা গাড়ীর খুবই কাছে আসিয়া চলাফিরা করিতে-ছিল। যেই সব প্রাণীর কথা পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছি বা চিড়িয়াখানায় যাহাদের দুই-একটিকে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে দলে দলে দেখিয়া কতই না আনন্দ হইল! আমি অপলকদৃষ্টিতে সেগুলিকে দেখিতেছিলাম, এমন সময় মামাবাবু বলিলেন,—"দেখ্ দেখ্ খোকা, এই জানোয়ার-গুলো দেখ্।"

তাঁহার কথা শুনিয়া চাহিয়া দেখিলাম—একরকমের অদ্ভুত প্রাণী চরিয়া বেড়াইতেছে। সেই প্রাণীগুলির মুখ ও পা হরিণের মত, মাথা মহিষের মত, আর শরীরের পিছনের দিক ও লেজ ঘোড়ার মত। ঐ জানোয়ারের নাম নূ (gnu)।

অনেকগুলি ছোট-বড় নূ একসঙ্গে চরিতেছিল। দেখিয়া মনে হইল নূ-গুলি জগৎস্রষ্টার এক অপরূপ ও অভিনব সৃষ্টি।
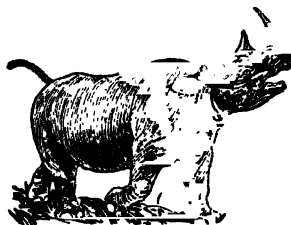
গণ্ডার
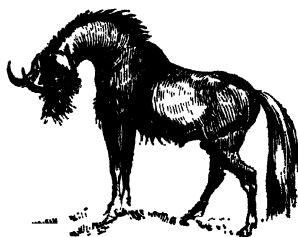
বিভিন্ন রকম জন্তু-জানোয়ার দেখিতে দেখিতে ভাবিলাম, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশটাই ভগবানের এক বিরাট ও বিচিত্র
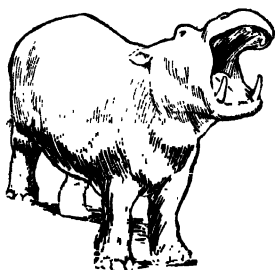
জলহস্তী
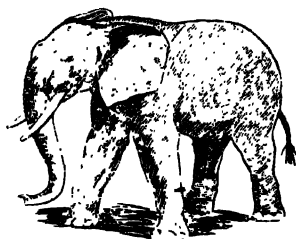
হস্তী

চিড়িয়াখানা। সেই চিড়িয়াখানায় সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, শিম্পাঞ্জী, বেবুন, গরিলা, জলহস্তী, কুম্ভীর প্রভৃতি বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী

থাকিলেও ব্যাঘ্র নাই। বাস্তবিক গরিলা, জেব্রা, জিরাফ, উটপাখী, নূ-প্রভৃতি জন্তুগুলি আফ্রিকার নিজস্ব।

গরিলা

গাড়ীতে বসিয়া মামাবাবুর নিকট আফ্রিকার জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই জানিলাম। দক্ষিণ

আফ্রিকার গরিলা ও কুম্ভীর খুবই ভয়ানক প্রাণী। গরিলা বা বন-মানুষ দেখিতে মানুষের মত হইলেও উহার শরীরে অসীম শক্তি, এবং শরীরের তুলনায় মাথাটি ছোট।

লোকালয় হইতে বহু দূরে—গহন অরণ্যের মধ্যে গরিলা বাস করে; চলাফেরা করিবার সময় উহাদের সম্মুখে বড় বড় গাছ পড়িলেও অবলীলাক্রমে তাহা ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া পথ করিয়া লয়। গরিলা শিকার করা বড়ই বিপজ্জনক।

আফ্রিকার হাতী ভারতীয় হাতী হইতে কোন কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র। উহাদের কান ভারতীয় হাতীর কান হইতে অনেক বড়; মদ্দা ও মাদী উভয় জাতীয় হাতীরই দাঁত আছে।

নানা কথাবার্ত্তায় সময় কাটিয়া গেল। বেলা ৯ টা ২০ মিনিটের সময় গাড়ী নাইরোবি ষ্টেশনে পৌঁছিল। মোম্বাসা হইতেই মামাবাবু তার করিয়া দিয়াছিলেন; তাই তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব, দুই ছেলে ও দারোয়ান রামরাম সিং ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। আমরা প্ল্যাটফরমে নামিতেই সকলে আসিয়া মামাবাবুকে ঘিরিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং সাদর-সম্ভাষণ জানাইলেন। মামাত ভাই দুইটি আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

মোম্বাসা হইতে নাইরোবি ৩৩০ মাইল। সেই পথ অতিক্রম করিতে আমাদের প্রায় সাড়ে সতের ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে। তবে সকালবেলা দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে যে সব

মনোহর দৃশ্য ও জানোয়ারের মেলা দেখিয়াছিলাম তাহা সহজে ভুলিব না।

আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার কয়েক মিনিট পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা বাসায় যাইয়া পৌঁছিলাম। সেখানে মামীমা ও বাসার আর আর সকলে আমাকে দেখিয়া খুবই খুসী হইলেন। কি করিলে যে আমি সুখী হইব, তাহাই যেন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইল। প্রায় সপ্তাহকাল কোথায়ও কিছু দেখিতে যাই নাই; কেবল খাওয়া দাওয়া, গল্পগুজব আর ঘুমেই সময় কাটিল। ট্রেন-ষ্টীমারে ভ্রমণের ফলে আমার শরীরও অনেকটা খারাপ হইয়াছিল।

সমগ্র কেনিয়া উপনিবেশের মধ্যে নাইরোবি একটি সুন্দর সহর। অর্দ্ধশতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে বিচিত্র অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মিত হইয়া সহরটি নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানকার ভারতীয় বাজার ও পল্লীসমূহে এখনও অট্টালিকার বাড়াবাড়ি হয় নাই। ভারতীয় বাজারের সারি সারি দোকান-ঘরগুলি প্রায় সম-আয়তনে নির্ম্মিত হওয়ায় বড়ই সুন্দর দেখায়।

সহরের রাজপথগুলি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। তার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট রোড, সিক্সথ্ এভেনিউ, সেলিস্‌বারি রোড, লিমুরু রোড, এণ্ডার্‌সন রোড প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাইরোবিতে দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হাউস,

জেনারেল পোষ্ট-আফিস, মিউনিসিপালিটি আফিস, মিউনিসিপাল মার্কেট, গীর্জ্জা, হাসপাতাল, ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক, রেলওয়ের কারখানা, হোয়াইটওয়ে লেডল' কোম্পানীর দোকান
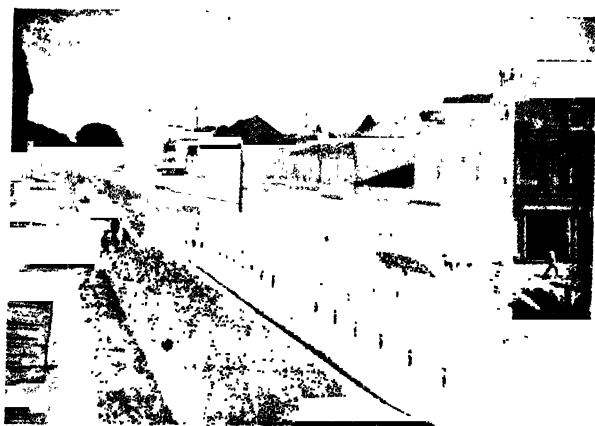
নাইরোবি সহর—গবর্ণমেণ্ট রোডের একাংশ

প্রভৃতি প্রধান। থিয়েটার-বায়োস্কোপ, সাধারণ পুস্তকাগার, মিউজিয়াম্ প্রভৃতিরও অভাব নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, আধুনিক সভ্য জাতিদের যে যে জিনিষের আবশ্যক, তাহার কোনটির অভাব সেখানে পরিলক্ষিত হয় না।

পাঁচ

ঙ্গোমা-পর্য্যবেক্ষণে

মামাবাবুর বাসায় অবস্থানকালে অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে সুখনলাল ছিল আমার অন্তরঙ্গ। বয়সে সুখন আমার চেয়ে দু'এক বৎসরের বড়; তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখখানা সরলতা-মাখানো।

সুখন হিন্দুস্থানী হইলেও বেশ্ ভাল বাংলা জানে। ছোটবেলায় সে নাকি কলিকাতায় তাহার কাকার কাছে ছিল; সেজন্যই বাংলা ভাষা আয়ত্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

সুখনলালের পিতার কাফির কারবার। নিজের বহু বিঘা-ব্যাপী ক্ষেত্রে যে কাফি উৎপন্ন হয়, তাহাই পৃথিবীর নানাস্থানে রপ্তানী করিয়া তিনি ক্রোরপতি হইয়াছেন। তাঁহার কারবারে অসংখ্য লোক খাটে; অথচ যিনি অতবড় একটা কারবারের মালিক, তিনি নিজে কিন্তু খুবই সাদাসিধা, তাঁহার চালচলনে একটুও আড়ম্বর নাই। সুখন পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার কাজে সহায়তা করেন, আর সে নিজে এখনও লেখাপড়া করে—কারবারের কোন ধার ধারে না।

একদিন বৈকালবেলা দুই বন্ধু বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। একথা সে-কথার পর সুখন বলিল,—"আচ্ছা ভাই, কিছুদিন বাইরে ঘূরে ফিরে আস্‌লে ভাল হ'ত না কি? একঘেঁয়ে জীবন কি ভাল লাগে—কি বল?"

বেড়াইবার আমারও যথেষ্ট সখ, তথাপি টাকা-পয়সার অভাবে একটু আম্‌তা আম্‌তা করিতেছিলাম; সুখন সেই ভাবটা বুঝিয়াছিল, তাই আশ্বাস দিয়া বলিল,—"কুচ্‌ পরোয়া নেই; আরে টাকার কথা ভেবো না, সে ব্যবস্থা হবে'খন। কালই কিন্তু রওনা হ'ব, তুমি প্রস্তুত হও গে।"

কোথায় যাওয়া হইবে তাহাও ঠিক বুঝিলাম না, তথাপি বাসায় যাইয়া মামাবাবু ও মামীমাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। প্রথমটা তাঁহারা একটু আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু শেষে অনুমতি দিলেন,—অবশ্য বিশেষ সাবধানে চলাফেরা করিবার জন্য বারংবার উপদেশও দিলেন।

পথখরচের জন্য মামাবাবু কতক টাকা দিলেন; মামীমাও তাঁহার হাতখরচের টাকা হইতে কিছু দিয়াছিলেন—বলা বাহুল্য, সেই টাকার কথা মামাবাবু কিছুই জানিতে পারেন নাই।

যথাসময়ে ভ্রমণের আবশ্যক জিনিষপত্র লইয়া আমরা রওনা হইলাম। ঠিক হইল প্রথমতঃ ন্যারি সহর হইয়া মাউণ্ট

কেনিয়া নামক পর্ব্বত দেখা হইবে। ন্যারি সহর নাইরোবি হইতে ১১৩ মাইল উত্তরে; ট্রেনে অথবা মোটর গাড়ীতে যাওয়া যায়। আমরা ট্রেনে রওনা হইলাম এবং প্রায় সাড়ে আট ঘণ্টা পরে তথায় পৌঁছিলাম।

ছোট হইলেও ন্যারি বেশ্ সুন্দর সহর। উহার চারিদিকের দৃশ্য বাস্তবিকই মনোরম। ইতস্ততঃ পায়ে হাঁটিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইবার যথেষ্ট জায়গা সেখানে আছে।

সহরের আশে পাশে শিকারের স্থানেরও অভাব নাই। ঐ অঞ্চলে ওরিক্স্, ইল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা জাতীয় হরিণ, জিরাফ ও উটপাখী সচরাচর দেখা যায়—মাঝে মাঝে পশুরাজ সিংহও ঐ সব নিরীহ প্রাণীদের অনুসরণ করিয়া থাকে।

ঐ সহরেও সুখনদের আর একটা কাফির কারবার আছে—তাহাতে অনেক লোক কাফি-উৎপাদনকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

ন্যারি সহরে মাত্র একরাত্রি থাকিয়া, পরদিন আমরা মোটরে চড়িয়া মাউণ্ট কেনিয়ার দিকে রওনা হইলাম।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন মাঘ মাস—আমাদের দেশে ভরা শীতকাল; কিন্তু সেখানে ততটা শীতের তীব্রতা নাই—শীত গ্রীষ্ম দুইই যেন সমান। পথে চলিবার সময় মাঝে মাঝে ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় প্রাণ জুড়াইল।

কয়েক ঘণ্টা পরে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইলাম। পর্ব্বতটা খুব উচ্চ নয়, কিন্তু উহার দৃশ্য মনোহর। পর্ব্বতের পাদদেশে

নানাজাতীয় অসংখ্য গাছ। মৃদুমন্দ বাতাসে তাহাদের পত্রগুচ্ছ সঞ্চালিত হইতেছিল। সেই সব গাছের পর খানিকটা খোলা জায়গা—তারপরই সামান্য উচ্চ ভূ-খণ্ড জুড়িয়া অবিচ্ছিন্ন বৃক্ষশ্রেণী আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে—বহু দূরে দুই-চারিটি কৃষ্ণসার মৃগ কচি কচি ঘাস খাইতেছিল।
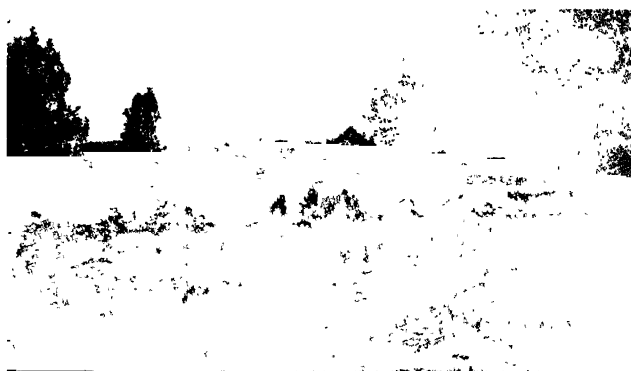
দূর হইতে মাউণ্ট কোনয়ার দৃশ্য

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা ঐ দৃশ্য সমূহ উপভোগ করিলাম, শেষবেলায় সহরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম।

ন্যারি সহরের মাইল কয়েক পূর্ব্বদিকে এক সাহেবের কুঠি। তার চারিদিক জুড়িয়া বহুদূর বিস্তৃত কাফিক্ষেত্র; মাঝে মাঝে দুই-চারিখণ্ড ভুট্টাক্ষেত্রও রহিয়াছে। চারিদিকে সবুজ শস্য-ক্ষেত্রের মাঝখানে সাহেবের লাল কুঠিখানা অপূর্ব্ব সুন্দর।

সাহেব সুখনের পিতৃ-বন্ধু। ফিরিবার পথে আমরা তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সাহেব খুবই অমায়িক-প্রকৃতি। তাঁহার সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম।

সাহেবের মুখে শুনিলাম পরদিন তাঁহার কুঠির সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় 'ওয়াকাম্বা ঙ্গোমা' (Wakamba Ngoma) হইবে। কথাগুলি শুনিয়া—উহা যে কি তাহা জানিবার জন্য খুব কৌতূহল হইল; 'ওয়াকাম্বা' বা 'ঙ্গোমা' শব্দ দুইটি হইতে মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সাহেবের এক ছেলে আমাদের সমবয়সী; বিষয়টা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাকেই ধরিয়া বসিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মাউণ্ট কেনিয়ার দক্ষিণের এ অঞ্চলে যে সব কাফ্রি বাস করে, তা'রা ওয়াকাম্বা নামে পরিচিত। যোদ্ধৃ-জাতি ব'লে আগে ওদের বেশ খ্যাতি ছিল; কিন্তু এখন আর ওরা যুদ্ধ করে না—বছরের বেশির ভাগ নিজেদের পল্লীতে আমোদ-আহ্লাদে কাটায়। কেবল মাস কয়েকের জন্য ওরা খামারে খাটে; তা'তে বেশ দু'পয়সা রোজগারও করে। ওদের সাময়িক কার্য্যকাল শেষ হবার দিনকয়েক আগে—ওদের উৎসাহিত কর্‌বার উদ্দেশ্যে আমরা ওদের জন্য একটা ভোজের ও নৃত্য-উৎসবের ব্যবস্থা ক'রে থাকি। ওদের ভাষায় ঐ নাচের নাম 'ঙ্গোমা'।

"একই খামারে নিযুক্ত লোক ছাড়া, অন্যান্য খামারের লোক

এবং ওদের নিজ নিজ আত্মীয়-বান্ধবদেরও ঙোমা-নৃত্যে যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তোমাদের দেশে বিয়ে বা অন্য কোন উৎসবে বন্ধু-বান্ধবদের যেমন নিমন্ত্রণ-পত্র দেওয়া হয়, ওয়াকাম্বাদেরও সেরূপ নিমন্ত্রণ-পত্র দিতে হয়।"

নিমন্ত্রণ-পত্রের কথা শুনিয়া সুখন বলিল,—"ওরা কি তবে লেখাপড়া জানে?"

—"না, ওরা লেখাপড়া জানে না, তবু পত্র একখানা চাই-ই। এজন্য আমাদের যে লোক নিমন্ত্রণ করতে যায়, সে একখণ্ড কঞ্চির মাথায় এক টুক্‌রো কাগজ এঁটে নিয়ে যায় এবং সবাইকে বলে—'অমুক খামারে অমুক দিন ঙোমা হবে, তোমরা সবাই ঠিক সময়ে যেও কিন্তু; এই দেখ সাহেবের চিঠি।'"

পরের দিনের কথা। বেলা তখন এগারটা; চারিদিক হইতে ঢাকের শব্দ শুনা গেল। খানিক পরে কাফ্রিরা ঢাক বাজাইয়া দলে দলে আসিতে লাগিল—স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সবাই নৃত্য-ভূমিতে জড় হইল। একটু পরে নাচ আরম্ভ হইল।

প্রথমেই সুরু হইল বিবাহিত পুরুষ ও মেয়েদের নাচ। তাহাদের সাজ-সজ্জার মধ্যে পুরুষদের হাতে বালা-বাজু, পায়ে ঘুঙুর—আর কাহারও কাহারও মুখ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত। মেয়েদের অলঙ্কারের মধ্যে গলায় হাঁসুলির মত মোটা মোটা তার,

কোমরে হল্‌দে, সবুজ প্রভৃতি বর্ণের বড় বড় কাচের মালা, আর হাতে মোটা মোটা বালা ও বাজু। গয়নাগুলির বেশির ভাগ তামা ও পিতলের তৈয়ারী। নৃত্যের জন্য সজ্জিত মেয়ে ও পুরুষ সকলের পরিধানেই এক প্রকার ছাগচর্ম্ম ছিল।

ওয়াকাম্বারা নৃত্য-ভূমিতে জড় হইতেছে

তাহাদের পরে আসিল অবিবাহিত যুবক ও মেয়ের দল। তাহাদের গয়না ও অন্যান্য সাজ-সজ্জার খুবই বাড়াবাড়ি। তাহাদের ভাষায় যুবকদের বলে 'য়্যানাকে' (Anake), আর মেয়েদের বলে 'ণ্ডিটো' (Ndito)। য়্যানাকের দল বিপুল

জয়ধ্বনি সহকারে তীর-ধনুক আস্ফালন করিতে করিতে নৃত্য-ভূমিতে অগ্রসর হইল।

সভ্যদের মাপকাঠিতে তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ উন্নত
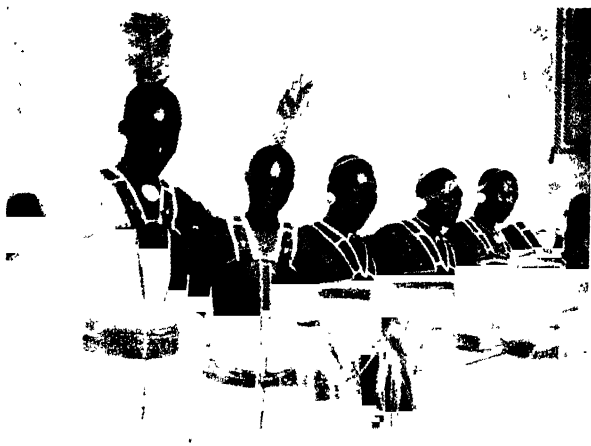
নৃত্য-সাজে য়্যানাকের দল

না হইলেও অথবা তাহাদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইলেও—তাহাদের সবল পেশীযুক্ত দেহকান্তি দেখিয়া মনে আনন্দের

সঞ্চার হয়। তাহাদের মধ্যে একটি লোককেও রোগজীর্ণ বা কৃশ দেখা গেল না।

তাহারা ইতস্ততঃ তাকাইয়া ঢাকের তালে তালে—কখনও আস্তে আস্তে, কখনও বা জোরে জোরে নাচিতে লাগিল। নৃত্যচ্ছন্দে তাহাদের পৃষ্ঠস্থিত তূণীর ও শিরোভূষণ উটপাখীর পালক বিচিত্র ভঙ্গীতে দুলিতেছিল।

পুরুষ ও মেয়েরা মুখোমুখি হইয়া নাচিতেছিল। এই ভাবে অসংখ্য দর্শকের সাম্‌নে নাচিলেও বয়স্কা মেয়েদের বেশ লজ্জাশীলা বলিয়াই মনে হয়; কারণ দর্শকদের মুখের দিকে তাহারা একবারও তাকায় নাই।

প্রায় চারি ঘণ্টাকাল এই অদ্ভুত লাস্য ও তাণ্ডব চলিল। প্রথমটা আমরা বেশ উপভোগ করিলাম; কিন্তু ক্রমশঃই জনতার কোলাহল ও ঢক্কা-নিনাদে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম।

বেলা প্রায় তিনটার সময় নৃত্য-পর্ব্ব শেষ হইলে ভোজের পালা সুরু হইল। ভোজের জন্য সাহেবের কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বদিন কতকগুলি হরিণ ও দুইটা বড় বড় জেব্রা শিকার করিয়া প্রচুর মাংসের ব্যবস্থা করিয়াছিল—দেশী মদও যথেষ্টই তৈয়ারী করান হইয়াছিল।

ওয়াকাম্বাদের দুইজন নেতার উপর খাদ্য বণ্টন করিবার ভার দেওয়া হইল। সে এক বিরাট ব্যাপার। অত লোকের মধ্যে কি ভাবে খাদ্য বণ্টন করা হইল, তাহাও একটা দেখিবার

বিষয়। নেতা দুইজন বিভিন্ন দলের সর্দ্দারের নিকট তাহার দলের লোকদের জন্য মদ ও মাংস ভাগ করিয়া দিল; সর্দ্দার আবার পর্য্যায়ক্রমে তাহা ভাগ করিয়া প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তাকে দিল। এইভাবে বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত ভোজন-ক্রিয়া শেষ হইল।

'য়্যানাকে' বা 'গুিটোর' দল মদ্যপান করিল না। তাহারা বয়োবৃদ্ধদের সম্মুখে মদ্যপান করা দোষাবহ কার্য্য মনে করে। তাহাদের বর্ব্বর ও অসভ্য নামে অভিহিত করা হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান দেখাইবার যে রীতি দেখিলাম, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওয়াকাম্বারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া—সর্দ্দারদের সহিত স্ব স্ব পল্লীতে প্রতিগমন করিল।

পরদিন প্রাতে আমরা পুনরায় ন্যারি সহরে ফিরিয়া আসিলাম।

ছয়

ফ্ল্যামিঙ্গো দর্শনে

ওয়াকাম্বা কাফ্রিদের নাচ দেখিয়া ন্যারি সহরে ফিরিবার পর দুইটি দিন কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন সুখনলালের খেয়াল চাপিল—রাত্রিতে ঐ অঞ্চলের বন্য জানোয়ার দেখিবে।

আমরা শিকারের জন্য সেখানে যাই নাই, তা' ছাড়া কোন অস্ত্র-শস্ত্রও আমাদের সঙ্গে ছিল না। কথায় বলে—'ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার!' আমাদের অবস্থাও ছিল তাই। তেমন নিরস্ত্র অবস্থায় কি ভাবে বন্য জানোয়ার দেখিতে সে সাহসী হইল, তাহা ভাবিয়া আমি অবাক্ হইলাম; রহস্য করিয়া বলিলাম,—"কি হে একেবারে যে রাতারাতি মসী ছেড়ে অসি ধর্‌বার মতলব ক'রেছ! ব্যাপারখানা কি শুনি? জানোয়ারদের পাল্লায় যেতে হ'লে ত আত্মরক্ষার জন্য কিছু হাতিয়ারপত্র চাই, তার কি ব্যবস্থা ক'রেছ? সে সব কি বিলাত থেকে উড়ো জাহাজে আস্‌ছে?"

রহস্যের উত্তরে সুখন যাহা বলিল, তাহাতে বন্য জন্তু দেখায় বিপদ ও ভয়ের কারণ অনেকটা কমিয়া গেল—একেবারে দূর হইল বলিতে পারি না। কারণ, নিত্য পোষা গরু-মহিষ দেখাই

আমাদের অভ্যাস ; কালে ভদ্রে কখনও বা চিড়িয়াখানায় খাঁচায় আবদ্ধ দুই চারিটি আধ-মরা হিংস্র জানোয়ার দেখিয়াছি। হিংস্র
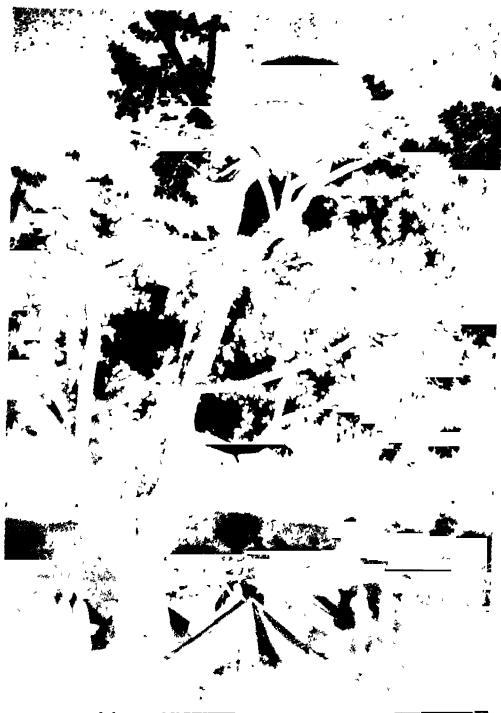
বৃক্ষের উপর মঞ্চ
(বন্যজন্তু পর্য্যবেক্ষণের জন্য নির্ম্মিত)

জানোয়ার দেখার সাহস এবং অভিজ্ঞতা ত আমাদের ঐ পর্য্যন্তই।

সে বলিল—ন্যারি সহরের কয়েক মাইল দূরে বনমধ্যে একটা জলাশয়ের ধারে খানিকটা খোলা জায়গা আছে। রাত্রিকালে বন্য জানোয়ার পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য কোন একটা সাহেব কোম্পানী ঐ খোলা জায়গার ধারে একটা বিরাট গাছের উপর মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহাতে আলোকেরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কিছু টাকা খরচ করিলেই মঞ্চের উপর বসিয়া রাত্রিবেলা নিরাপদে বন্য জন্তু পর্য্যবেক্ষণ করা যায়।

আমার শরীর বিশেষ ভাল ছিল না; তাই সুখনের নৈশ অভিযানে যোগ দিতে পরিলাম না। তাহাতে সুখন কতকটা ক্ষুণ্ণ হইলেও—পূর্ব্বেই সব ব্যবস্থা ঠিক করা হইয়াছিল বলিয়া, তাহাদের ন্যারি-আফিসের বড়-বাবুকে সঙ্গে লইয়া সে বন্য জানোয়ার দেখিতে রওনা হইল।

পরদিন সকালে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা জানোয়ারদের অনেক গল্প করিল। তাহারা বলিল, রাত্রিতে দলে দলে হাতী, গণ্ডার এবং নানা জাতীয় হরিণ জলাশয়ে জলপান করিতে আসিয়াছিল। কোন কোন দল জলে পড়িয়া অনেকক্ষণ খেলা করিয়াছে, আবার কোন দল যেন শশব্যস্তে চলিয়া গিয়াছে। রাত্রির শেষভাগে একটি সিংহীও কয়েকটি শাবকসহ জলাশয়ের ধারে আসিয়াছিল। সে যতক্ষণ সেখানে ছিল, অন্য জানোয়ারেরা কাছে ঘেঁসিতে সাহস পায় নাই; তবে

সিংহী ও তাহার শাবকগণ

সিংহী বেচারী লোলুপদৃষ্টিতে ইতস্ততঃ তাকাইলেও কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।

সেই দিনও ন্যারি সহরে থাকিয়া পরদিন আমরা **নকুরু** অভিমুখে রওনা হইলাম। পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে—বনাঞ্চলের ফাঁকে ফাঁকে কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে। বনভূমিতে বিভিন্ন রকম হরিণ ও উটপাখীর দল বিচরণ করিতেছে। মোটরের শব্দে কেহ উর্দ্ধশ্বাসে দূরে পলায়ন করিতেছে, কেহ বা আবার মুখ তুলিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে।—সে এক অভিনব দৃশ্য! প্রায় দ্বিপ্রহর সময় আমরা ন্যারি হইতে ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী **টম্সন প্রপাতের** নিকটবর্ত্তী হইলাম।

কেনিয়া-উগাণ্ডা রেলওয়ের **গিল্‌গিল্‌** নামক জংশন হইতে একটি শাখা-লাইন প্রপাতের সন্নিহিত সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সহরটি খুব বড় না হইলেও বেশ্ সুন্দর।

সূর্য্যাস্তের কিছু আগে আমরা প্রপাতের দৃশ্য দেখিতে গেলাম। প্রায় একশত হাত উপর হইতে প্রপাতের জলধারা ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে নীচে পড়িয়া চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া যাইতেছে। সেই জলধারায় অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায় মনোরম রামধনুর সৃষ্টি হইয়াছিল।

তার পরদিন আমরা পুনরায় রওনা হইলাম। মালভূমি অঞ্চলের মধ্য দিয়া গাড়ী অগ্রসর হইয়া চলিল। ঘণ্টাখানেক পরে গাড়ী ক্রম-নিম্ন পথে সবেগে উপত্যকাভূমির দিকে চলিল।

পথের দুই ধারে কোথাও নিবিড় দেবদারু বন, আর কোথাও ভুট্টাক্ষেত্র। ঐ অঞ্চলে প্রচুর ভুট্টা জন্মে। সমগ্র কেনিয়া উপনিবেশ হইতে প্রতিবৎসর দশ-পনের লক্ষ মণ ভুট্টা বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার একটা বিশিষ্ট অংশ নকুরু সহরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিতে উৎপন্ন হয়।

বেলা প্রায় ১০টার সময় আমরা নকুরু সহরে পৌঁছিলাম। আহার ও বিশ্রামে দুপুরবেলার সময়টুকু কাটিয়া গেল। শীতের বেলা শেষ হইয়া আসিল—সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশের অনেক নীচে নামিয়া পড়িয়াছেন। আমরা পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

নকুরু সুন্দর সহর। রাস্তাগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি গাছ, আর তাহাদের মাঝে মাঝে লাইট-পোষ্ট। সন্ধ্যার পরে আলো জ্বলিয়া উঠিলে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে আলো-ছায়ার বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে বড়ই মনোরম।

'ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার' একটা ব্রাঞ্চ আফিস ঐ সহরে আছে। আফিসগৃহটি দুইটি প্রশস্ত রাস্তার সংযোগস্থলে অবস্থিত। সুখনের এক বন্ধু ঐ আফিসে কাজ করেন। দিনের কার্য্য শেষে তিনিও আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলেন।

বড় বড় সওদাগরী আফিস, বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, মেমোরিয়্যাল হাসপাতাল প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে আমরা চলিয়াছি। সহর-সীমান্তে কোথায়ও কোথায়ও দুই-চারিটি কাফ্রি-শিশুকে ইতস্ততঃ খেলা করিতে দেখা গেল।

তাহাদের কেহ কেহ লবণ খাইতেছিল। লবণ খাইতে উহারা বেশি ভালবাসে। আমরা যেভাবে মিশ্রী খাই, তাহারা ঠিক সেইভাবে লবণ খায়।

শিশুগুলির হাতে পায়ে এত বেশি গয়না যে, বেচারারা সে সব নাড়া চাড়া করিয়া স্বচ্ছন্দে খেলিতে পারে বলিয়া মনে হইল না। তবে তাহাদের গায়ে ত আর কাপড়-চোপড়ের বাড়াবাড়ি নাই, কাজেই নির্ম্মল আলো ও মুক্ত বায়ু উপভোগ করিয়া তাহারা বেশ্ স্বাস্থ্যবান্ হইয়াই বাড়িতেছে।

আমরা যখন সহরের অদূরবর্ত্তী হ্রদের নিকট পৌঁছিলাম, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু জমাট অন্ধকার, তখনও পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে নাই। তাহা ছাড়া তখন ছিল শুক্লপক্ষ; অন্ধকারে দৃষ্টিরোধ হইবার আশঙ্কা ছিল না।

হ্রদের বুকে তখন ফ্ল্যামিঙ্গো পাখীর মেলা বসিয়াছিল। অসংখ্য পাখী হ্রদের জলে খেলা করিতেছিল। এমন সুন্দর পাখী একত্রে অতগুলি দেখিবার মত সুযোগ সচরাচর হয় না।

ফ্ল্যামিঙ্গো জলচর পাখী এবং হাঁসের মত যুক্ত পদাঙ্গুলি-বিশিষ্ট। এক একটি পাখী দাঁড়াইলে একজন পরিণত-বয়স্ক মানুষের সমান উঁচু হয়। তাহাদের গলা এবং পা দুইখানি খুব লম্বা হওয়ায় জল-কাদায় খাবার খুঁজিবার বিশেষ সুবিধা। তাহাদের ঠোঁটের গঠনেও যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে।

কাফ্রি-শিশু

সাধারণতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলেই ফ্ল্যামিঙ্গো বাস করে। আফ্রিকার ঐ অঞ্চল ব্যতীত আমেরিকায় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বাহামা, কিউবা, হেইতি প্রভৃতি দ্বীপে এবং পেরু ও গিয়ানা প্রদেশে উহারা দলে দলে বাস করে। আমাদের দেশেও সময়ে সময়ে ঐ জাতীয় পাখী দেখা যায়। সব চাইতে

ফ্ল্যামিঙ্গোর ঠোঁট

উহাদের চোখ-ঝলসানো লাল পালকগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। সম্ভবতঃ উহাদের গায়ের রং 'ফ্ল্যাম' (flame) বা অগ্নিশিখার মত লাল হওয়াতেই উহাদের নাম হইয়াছে ফ্ল্যামিঙ্গো।

স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া আমরা

ফ্ল্যামিঙ্গোদের জলক্রীড়া দেখিলাম; রাত্র প্রায় ৯ টার সময়

ফ্ল্যামিঙ্গো

সহরের দিকে ফিরিলাম। বলা বাহুল্য, সেই রাত্রে সুখনের বন্ধুর বাসাতেই আমরা আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সাত

এল্‌গন পাহাড়ে

আমরা সমতলভূমির অধিবাসী। নিয়ত শস্য-শ্যামল বিস্তৃত মাঠের শোভা দেখিতেই আমরা অভ্যস্ত। কাজেই আফ্রিকার পাহাড়-পর্ব্বত, নদী, উপত্যকা ও মালভূমি-পরিবৃত নিত্য নূতন বিচিত্র দৃশ্য আমাদিগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সুযোগ পাইয়া আমরা তাহা পূরামাত্রায় উপভোগ করিতে লাগিলাম।

নকুরু সহরে আমরা তিনদিন অবস্থান করিলাম। সুখনের বন্ধুটি খুব সদাশয় লোক; আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি ছিল না। সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি তিনি একটি একটি করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন।

যে অনুচ্চ পাহাড়ের পাদমূলে নকুরু সহর, বহু প্রাচীনকালে তাহা আগ্নেয়গিরি ছিল, কিন্তু এখন তাহা নির্ব্বাপিত। দ্বিতীয় দিন মোটরে চড়িয়া, আমরা ঐ পাহাড়ের অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলাম। ইচ্ছা করিলে আরও উঠিতে পারিতাম, কিন্তু বেলা বেশি ছিল না বলিয়া সকলে একটা ঢালু জায়গায় বসিয়া

পড়িলাম। সেখানে বসিয়া চারিদিকে চাহিতেই অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য সমূহ চোখে পড়িল। অদূরে **নকুরু হ্রদ**। দূরবীণ দিয়া দেখিলাম তাহার দক্ষিণে—অনেক মাইল দূরে একটি হ্রদ, তার পর আরও একটি ;—সর্ব্বদক্ষিণেরটির নাম **নাইবাসা হ্রদ**। নকুরু হ্রদের উত্তরদিকেও **সোলাই** ও **বারিঙ্গো** নামে দুইটি হ্রদ রহিয়াছে—অবশ্য ঐগুলিও খুব কাছে কাছে নয়। বারিঙ্গো হ্রদ ঐ স্থান হইতে সম্ভবতঃ ৫০।৬০ মাইল দূরে। জানিতে পারিলাম, বছরের কোন কোন সময়ে ঐ হ্রদে যথেষ্ট শিকার মিলে।

নকুরু হ্রদের একধারে পূর্ব্বদিনের ন্যায় ফ্ল্যামিঙ্গোর মেলা বসিয়াছিল। অপর ধারে দুইটি জলহস্তী—একটি ধাড়ি ও অপরটি বাচ্ছা—জলে পড়িয়া খেলা করিতেছিল। সম্ভবতঃ সেই জন্যই ফ্ল্যামিঙ্গোরা ঐ দিকে ঘেঁসিতে সাহস করে নাই।

পাহাড়ের উপর বসিয়া এক একবার মনে হইল—যদি নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার লুপ্ত শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কি হইবে ?—পাহাড়ের আট-নয় মাইল বিস্তৃত উন্মুক্ত মুখের ভিতর দিয়া গলিত ধাতু, ভস্ম ও অগ্নিপ্রবাহ প্রভৃতি অবিশ্রাম বাহির হইয়া, নিমেষমধ্যে আমাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবে,—আর পার্শ্ববর্ত্তী কয়েক ক্রোশ বিস্তৃত ভূভাগের অগণিত জীবজন্তু ও মানুষ জীবন্ত সমাধি লাভ করিবে। সুখের বিষয় বিগত কয়েক শতাব্দীর

মধ্যেও পাহাড় তেমন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে নাই—তাহা হইলে কি আর তাহার পাদদেশে তেমন সুন্দর জনপদ গড়িয়া উঠিতে পারিত ?

তার পরদিন আমরা **এল্‌ডোরেট** সহরের দিকে যাত্রা করিলাম। ঐ সহর নকুরু হইতে ১২৫ মাইল দূরে; ট্রেনে অথবা মোটরে যাওয়া যায়। আমরা ট্রেনে রওনা হইলাম। নকুরু সহরের পরবর্ত্তী নকুরু জংশন নামক ষ্টেশন হইতে রেল লাইন দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক শাখা **ভিক্টোরিয়া হ্রদের** তীরবর্ত্তী **কিসুমু** বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অপর শাখা এল্‌ডোরেট হইয়া ক্রমে উগাণ্ডার অন্যতম প্রধান নগর **কাম্পালা** পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ঐ দেশের ভূভাগ কোথায়ও একেবারে সমতল নয়। সর্ব্বত্র ছোট-বড় পর্ব্বত-শ্রেণী, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদী-নালা এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত উপত্যকা ও উচ্চ মালভূমিসমূহ রহিয়াছে। তেমন বন্ধুর প্রদেশের মধ্য দিয়াই রেলপথ। কোথাও পাশাপাশি দুইটি পর্ব্বতশৃঙ্গ আর তার মধ্যে সুগভীর খাদ; তেমন স্থানেও লৌহবর্ত্ম অবাধে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

এই যুগে মানুষ বিজ্ঞান-বলে অসাধ্য সাধন করিতেছে। ঐ রেলপথগুলিতেও বিজ্ঞান-বলে অপূর্ব্ব সেতুসমূহ তৈয়ারী হইয়াছে। গভীর খাদের উপর দিয়া পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ হইতে অন্য শৃঙ্গ পর্য্যন্ত বহু গজ দীর্ঘ সেতু রহিয়াছে। ঐ রকম

সেতু একটি দুইটি নয়—সমগ্র লাইনে ঐ ধরণের অসংখ্য সেতু আছে। ইংরাজিতে উহাদিগকে বলে 'ভায়াডাক্ট' (viaduct)।

ঐ সব সেতুর উপর দিয়া ট্রেন চলিবার সময় নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনোরম দৃশ্যরাজি চোখে পড়ে। কোথাও খাদের মধ্য দিয়া তর্‌তর্ করিয়া জলস্রোত চলিয়াছে, তাহার
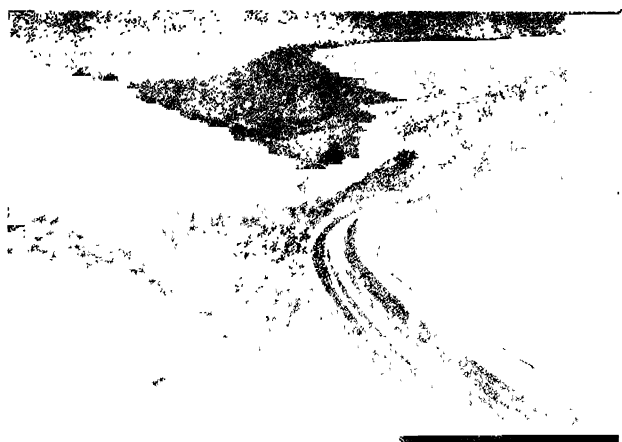
ভায়াডাক্ট

পাশে নানা রকম পাখী ও বন্য জানোয়ারেরা খেলা করিতেছে; কোথাও অন্ধকারময় নিবিড় জঙ্গল; আবার কোথাও বা দুর্গম স্থানে কণ্টকময় লতাগুল্ম ও ঝোপ-ঝাড়—তাহাদের মধ্যে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত অসংখ্য ফুল ফুটিয়া নির্জ্জনে সৌরভ ছড়াইতেছে!

এইভাবে বিভিন্ন চড়াই উতরাই ছাড়াইয়া গাড়ী ক্রমশঃ

ক্রমোন্নত পথে চলিতে লাগিল। কয়েকটি ষ্টেশনের পর, **টিম্বোরোয়া** নামক ষ্টেশনে পৌঁছিলে জানিতে পারিলাম যে, ঐ ষ্টেশন সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় পৌনে দুই মাইল উপরে স্থাপিত এবং সমগ্র কেনিয়া-উগাণ্ডা রেল লাইনের মধ্যে ঐ স্থানই সর্ব্বোচ্চ। তার পর হইতেই গাড়ী পুনরায় ক্রম-নিম্ন পথে চলিতে লাগিল।

পথের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য ভুট্টা ও কাফিক্ষেত; আবার কোন কোন স্থানে বহুদূর বিস্তৃত বাঁশবনও রহিয়াছে। ঐ অঞ্চলে উৎপন্ন বাঁশ হইতে প্রচুরপরিমাণে কাগজের মণ্ড তৈয়ারী হয়।

আরও অগ্রসর হইলে অনেক ইউরোপীয় লোকের বসতি দৃষ্টিগোচর হইল। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম এল্‌ডোরেট সহরে ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে ওলন্দাজ জাতীয় অনেক লোক স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছে। ক্রমশঃ চলিতে চলিতে—প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা পরে আমরা এল্‌ডোরেট সহরে পৌঁছিলাম।

এল্‌ডোরেট সহরের জলবায়ু বেশ্ স্বাস্থ্যকর। সম্ভবতঃ এইজন্য বিভিন্ন জাতীয় লোক তথায় বাস করে। অধিবাসীদের মধ্যে ওলন্দাজেরাই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সহরের পথ-ঘাট, দালান-কোঠা প্রভৃতি আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। ইংরেজ ও ওলন্দাজ উভয় জাতির পৃথক্ পৃথক্ গীর্জ্জা তথায় রহিয়াছে। স্কুল, ব্যাঙ্ক, ক্লাব প্রভৃতিরও অভাব নাই।

বলা বাহুল্য আমরা হোটেলেই আশ্রয় লইয়াছিলাম। পরদিন বৈকালবেলা সহরের উপকণ্ঠে সেল্‌বি প্রপাত দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রপাতের সন্নিহিত স্থানে বসিয়া বসিয়া এল্‌ডোরেট হইতে কোথায় যাওয়া হইবে তাহারই আলোচনা করিতেছিলাম। এমন সময় জনৈক ভদ্রলোককে দেখিতে পাইয়া, সুখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে "হ্যালো মিষ্টার নরদেও" বলিয়া, তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া প্রাণখোলা আলাপ জুড়িয়া দিল; পরে তাঁহার সহিত আমাকেও পরিচিত করিয়া দিতে কসুর করিল না। নরদেও বা নরদেববাবু সুখনদের ন্যারি আফিসের বড়-বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা; স্থানীয় ব্যাঙ্কে তিনি চাকুরী করেন।

অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হইল—দুইদিন পরে এল্‌গন পাহাড়ে বেড়াইতে যাওয়া হইবে এবং এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া নরদেববাবুও আমাদের সাথী হইবেন। তৎপূর্ব্বে তিনি নিজে একবার ঐ পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ অভিযানে তাঁহার অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ মূল্য ছিল।

এল্‌ডোরেট সহরের মাত্র দশ মাইল পরে লেসেরু ষ্টেশন। ঐ ষ্টেশন হইতে একচল্লিশ মাইল দীর্ঘ একটি শাখা লাইন কিটেল সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সেখান হইতে মোটরে মাত্র কুড়ি-একুশ মাইল পথ গেলেই এল্‌গন পাহাড়ের পাদস্থিত ক্বোইটোবোস নামক স্থানে পৌঁছান যায়।

পূর্ব্ব ব্যবস্থামত নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা তিনজনে রওনা হইলাম। ট্রেনে ও মোটরে চলিয়া প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে আমরা কোইটোবোস পোঁছিলাম। সেইদিন সেখানে বিশ্রাম করিয়া, পরদিন প্রত্যূষে যথোচিত সাজসজ্জা করিয়া আমরা পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলাম।

এল্‌গন পাহাড় ১৩,৮৭০ ফুট বা প্রায় পৌনে তিন মাইল উচ্চ। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে শীর্ষস্থানে যাইতে হইলে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় পনের মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। পাহাড়ে' পথে আমরা অনেক দূর পর্য্যন্ত মোটরে গেলাম।

সাত-আট মাইল পর্য্যন্ত পথের পাশে নিবিড় জঙ্গল এবং তাহার মাঝে মাঝে অনেক বড় বড় গহ্বর রহিয়াছে। সেই সব গহ্বরে পার্ব্বত্য লোকেরা বাস করে। এমন মস্ত বড় এক-একটি গহ্বর দেখা গেল যে, তাহার মধ্যে কয়েকটি পরিবার তাহাদের পালিত পশুপক্ষী সহ অনায়াসে বসবাস করিতেছে।

মোটর হইতে নামিয়া যখন আমরা পায়ে হাঁটিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছিলাম, তখনও দুপুর অতীত হয় নাই। সময় সময় বৃক্ষশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের উষ্ণ কিরণরাশি আসিয়া আমাদের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

চারিদিক্ নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দুই-চারিটি বন্য পক্ষীর কলরবে সেই নীরবতা ভঙ্গ হইতেছিল। নানা জাতীয় বন্য ফুলের গন্ধে বনাঞ্চল আমোদিত হইয়া গিয়াছিল। যতই

অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই প্রকৃতির সেই বিচিত্র কুঞ্জবনে—পাহাড়ের সেই নির্জ্জন প্রদেশে—অসংখ্য অযত্নসম্ভূত তরুলতা দেখিতে পাইলাম। তাহাদের শাখাপ্রশাখায় পত্রমুকুলের মাঝে মাঝে কত রং-বেরঙের সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

এল্‌গন পাহাড়ের একটি গুহা ও গুহাবাসিগণ

দেখিয়া মনে হইল যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্জ্জনে বসিয়া সেই বিচিত্র পুষ্প-সম্ভারে বিশ্বস্রষ্টার পূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন।

পর্ব্বতশৃঙ্গের কাছাকাছি পৌঁছিলে নরদেববাবু আমাদিগকে দুইটি আশ্চর্য্য প্রস্রবণ দেখাইলেন। তাহাদের একটির জল

একেবারে শীতল এবং অপরটির জল বেশ্ উষ্ণ; অথচ দুইটি প্রস্রবণই পাশাপাশি রহিয়াছে! তাহা ছাড়া পর্ব্বতশীর্ষে একটি ছোট হ্রদও আছে।

বিশ্বের যেখানে যে জিনিষের দরকার বিশ্বশিল্পী ভগবান সেখানে সেই জিনিষ তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ প্রয়োজনে সেই দুর্গম পর্ব্বত-শিখরে বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট দুইটি প্রস্রবণ ও একটি হ্রদের তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা তাহাদের দ্বারা কোন্ কলা-কৌশল তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কে বলিবে?

নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা শেষ হইয়া আসিল; কাজেই আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম।

অনেক রাত্রিতে আমরা কিটেল সহরে পৌঁছিলাম। সেই রাত্র সেখানে থাকিয়া, পরদিন পুনরায় এল্‌ডোরেট সহরে ফিরিয়া আসিলাম।

আট

নীলনদী-কূলে

এল্‌গন পাহাড় হইতে ফিরিয়া, আমরা আরও দুইদিন এল্‌ডোরেট সহরে ছিলাম। এল্‌ডোরেট সহরের অধিবাসীদের কথাও কিছু কিছু বলা হইয়াছে। ঐ সহরের দক্ষিণ হইতে কিস্থমু বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম **কবিরোণ্ডো** প্রদেশ। ঐ অঞ্চলের নামানুসারে সেখানকার কাফ্রিরা 'কবিরোণ্ডো নিগ্রো' নামে পরিচিত। তাহারা নাকি প্রাচীনকালে খুবই হিংস্রপ্রকৃতি ছিল এবং উলঙ্গ থাকিত, কিন্তু এখন তাহারা অনেকটা উন্নত হইয়াছে—তাহাদের বন্যভাব দূর হইয়াছে। তাহারা এখন কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। তাহাদের সবল পেশীযুক্ত বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া বাস্তবিকই মনে আনন্দ হয়। সহরের বুকেও তাহাদের দুই-চারিজনকে মাঝে মাঝে দেখা যায়।

আমি মনে করিয়াছিলাম এল্‌ডোরেট হইতেই বাসায় ফিরিয়া যাইব। সুখনকে সেই কথা বলিলাম, কিন্তু সে তাহা কানেই তুলিল না। দেশভ্রমণের তাহার খুব সখ। আমারও যে সেই সখ কম ছিল তাহা নহে, তবে সম্বল ফুরাইয়া

আসিতেছিল বলিয়াই আমার ফিরিবার উদ্যোগ। সুখন তাহা বুঝিয়াছিল, তাই বলিল,—"টাকা-পয়সার কথা ভেবো না হে —তা'র কোন অভাব হবে না। তবে যে পথে এসেছি, সে পথেই যে ফিরে যাবো তেমন কথা তুমি মনেও ক'রো না।"

রহস্য করিয়া বলিলাম,—"জগৎ শেঠ যখন সঙ্গে র'য়েছেন তখন টাকা-পয়সার কথা না হয় না-ই ভাব্‌লুম, তবে হুজুরের মত্‌লবখানা কি—তাই একবার শুনি!"

সুখন বলিল,—"হাঁ সে'কথাটাই বল্‌ছি। প্রথমে সপ্ত-শৈল নগর দেখে এন্‌টেব্বি যাবো। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া হ্রদটা প্রদক্ষিণ ক'রে—কিসুমুর পথে বাড়ী ফির্‌ব; এখন বুঝ্‌লে ত মত্‌লবখানা কি?"

আমি বলিলাম,—"হাঁ বুঝ্‌লুম। তবে কথা হ'ল,—সপ্ত-শৈল নগর আবার কোন্‌টা হে? কোনও ভূগোলে ত তার হদিস্‌ পাই নি!"

সুখন বলিল,—"ইউরোপের রোম নগরের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ এবং সেটা যে সাতটা পাহাড়ের উপর স্থাপিত তা'-ও বোধ হয় জান। উগাণ্ডার কাম্পালা নগরও সেরূপ সাতটা পাহাড়ের উপর স্থাপিত—তার কথাই ব'লেছি। তবে সেখানে যাওয়ার পথে আমরা জিঞ্জা সহরে দু'একদিন থেকে সেখানকার সব দৃশ্য, আর নীলনদীর উৎপত্তিস্থানটা দেখ্‌ব।"

* * * *

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা ট্রেনে রওনা হইলাম। রাত্রির অন্ধকারে চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে পাইতেছিলাম না। রেলের উপর ট্রেনের চাকার ঘর্ষণে যে বিকট শব্দ হইতেছিল তাহাই মাত্র শুনিতেছিলাম। পাহাড়ে' পথে নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া লৌহ-শকট হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুই দেখা যাইতেছিল না, তথাপি গাড়ীর গতিতে মনে হইল আমরা ক্রম-নিম্ন পথে চলিয়াছি।

খানিক পরে আমরা উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকাল-বেলা স্থখনের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিল। উঠিয়া হাত-মুখ ধুইলাম এবং সামান্য জলযোগের পর, জানালার পাশে বসিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ট্রেনে ভ্রমণের সময় জানালার পাশে বসিয়া থাকাই আমার অভ্যাস।

উগাণ্ডা প্রদেশের প্রধান উৎপন্নদ্রব্য কার্পাস-তূলা। সকাল হইতেই রাস্তার উভয় পার্শ্বে কাফি, তামাক ও ইক্ষুক্ষেত্রের মাঝে মাঝে বহুদূর বিস্তৃত কার্পাস-ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হইল। সে সব ব্যতীত কোন কোন স্থানে সারি সারি রবার গাছ এবং ক্যাকেও গাছও দেখা গেল। ক্যাকেও গাছে সাত-আট ইঞ্চি লম্বা লম্বা ফল হয়; সেই ফলের বিচি হইতেই 'কোকো' প্রস্তুত হয়। কোকো হইতে চকোলেট তৈয়ারী হয় এবং কোকো চা-এর ন্যায় পানীয়রূপেও ব্যবহৃত হয়।

বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা টরোরো নামক জংশনে

পৌঁছিলাম। সেখান হইতে প্রায় একশ' মাইল দীর্ঘ একটি শাখা রেল লাইন **সরোটি** পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

টরোরো ষ্টেশনে অনেক কাফ্রি দেখা গেল। কেনিয়া প্রদেশের কাফ্রিদের মত তাহাদেরও উলের মত কোঁকড়ানো চুল, লম্বাটে মাথা, চেপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট সবই আছে; সেই

ক্যাকেও গাছ

সব সত্ত্বেও তাহাদের চাল-চলন দেখিয়া মনে হইল তাহারা যেন কেনিয়া-কাফ্রিদের চেয়ে অনেকটা বিভিন্ন। কাম্পালা সহরে যাওয়ার পর—সব দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, আমার অনুমান নেহাৎ অমূলক নহে; উগাণ্ডার কাফ্রিরা কেনিয়া-কাফ্রিদের চেয়ে অনেকাংশে উন্নত।

টরোরো জংশন ছাড়িবার পর, গাড়ী প্রায় সমতল ভূমির

উপর দিয়া চলিতে চলিতে মধ্যাহ্ন সময়ে **মুলামুটি** নামক জংশনে উপস্থিত হইল। ঐ ষ্টেশন হইতে সামান্য কয়েক মাইল দীর্ঘ একটি শাখা লাইন **নমসাগলি** পর্য্যন্ত গিয়াছে। **য়্যালবার্ট** ও **কিয়োগা** হ্রদে বেড়াইতে ইচ্ছুক যাত্রীরা ঐ লাইনে ভ্রমণ করেন।

জংশন হইতে গাড়ী যেন কতকটা দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে চলিতে লাগিল; আকাশে আমাদের ডাইন দিকে সূর্য্য দেখা গেল।

বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা জিঞ্জা সহরে পৌঁছিলাম। এল্‌ডোরেট হইতে কমপক্ষে দুইশত মাইল ট্রেনে ভ্রমণের পর বেশ ক্লান্তিবোধ করিয়াছিলাম। কাজেই পূরা দুইটি দিন তথায় অবস্থান করিয়া আমরা বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিলাম।

জিঞ্জা সহরটি বেশ চমৎকার। দক্ষিণদিকে ভিক্টোরিয়া হ্রদের নীল জলরাশির শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। হ্রদের সংলগ্ন জেটি বা জাহাজ হইতে নামিবার জায়গাটিও দেখিবার মত বটে। সহরের উপকণ্ঠেই নীলনদীর উৎপত্তিস্থান; তাহার শোভা অনুপম।

আফ্রিকার হ্রদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া বৃহত্তম, আবার নদীর মধ্যেও নীলনদীই বৃহত্তম। বড় হইতে বড়র উদ্ভব খুবই শোভনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যেই নীলনদী পথে পথে অসংখ্য প্রপাতের সৃষ্টি করিয়া এবং মাঝে মাঝে শত শত মাইল যাবত খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া—বিভিন্ন পার্ব্বত্য অঞ্চল, সমভূমি

ও মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ ৩৬০০ মাইল পরিভ্রমণের পর অবশেষে ভূমধ্য সাগরের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তাহার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া কিন্তু তাহার বিশালতার বা প্রচণ্ড বেগের অনুমান করা যায় না। উৎপত্তিস্থানে উহা খুব প্রশস্তও নহে এবং উহার জলরাশিও ততটা চঞ্চল নহে। তবে শুনিয়াছি আরও কয়েক মাইল উত্তরে যাইয়াই নদী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রীপণ প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে।

উৎপত্তিস্থানের অদূরেই নদীর উপর দিয়া রেলওয়ে কোম্পানী অজস্র অর্থব্যয়ে 'নাইল্ ব্রীজ' নামে এক সুদৃঢ় সেতু
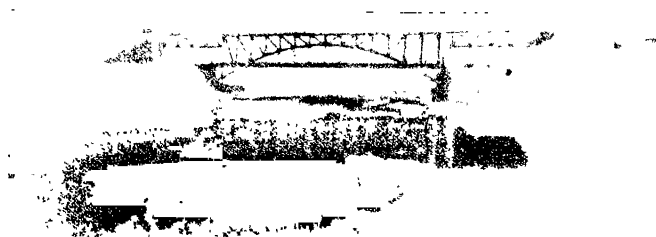
নাইল্ ব্রীজ

নির্ম্মাণ করিয়াছে। দ্বিতীয় দিন বৈকালবেলা সেতুর ধারে বসিয়া ইতস্ততঃ দেখিতেছিলাম।

উত্তরদিক হইতে মেঘের ডাকের মত অপূর্ব্ব শব্দ শ্রুত হইল; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহা সুপ্রসিদ্ধ রীপণ

জলহস্তী

প্রপাতের জলধারার পতন-শব্দ। আমরা কিন্তু ঐ প্রপাতের নিকটবর্ত্তী হইবার সুযোগ পাই নাই।

বহুদূরে দেখা গেল দুই-তিনটি গণ্ডার নদীর অগভীর জলে খেলা করিতেছে। সেতুর দক্ষিণদিকে—যেখানে হ্রদ ছাড়িয়া নদী উত্তর-বাহিনী হইয়াছে তাহার নিকটেই—চার-পাঁচটি জল-হস্তী সারা দেহ জলে ডুবাইয়া আরামে দাঁড়াইয়া ছিল।

হ্রদের কূলে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের মাঝে মাঝে শেওলাময় জলে ছোট ছোট মাছেরা লাফালাফি করিতেছিল। আর ছোট-বড় কতকগুলি জলচর পাখীও মাছগুলিকে শিকার করিবার জন্য বারংবার ছোঁ মারিতেছিল।

আমার মনে হইতে লাগিল মরুময় মিশর দেশের যে সামান্য অংশ মনুষ্যবাসের উপযোগী তাহাও ত একমাত্র নীলনদীর জলরাশিই শস্য-শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। নীলনদীর মোহনায় পলিমাটি সঞ্চিত হইতে হইতেই ত ক্রমশঃ মিশর দেশের সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই মিশর দেশকে যে "নীলনদীর দান" বলা হয় তাহা খুবই যুক্তিসঙ্গত। এহেন নীলনদীর উৎপত্তিস্থান দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি বলিয়া আমরা ভাগ্যবান্।

স্থানটি কত সুন্দর দৃশ্যেরই না কেন্দ্রস্থল!—উহার সান্নিধ্য লাভ করাও এখন সহজসাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এই মনোরম ও সুন্দর স্থান কি নিয়তই এমন ছিল?—না; শতাব্দীর পর শতাব্দী

ধরিয়া নীলনদীর উৎপত্তিস্থান মানুষের অজ্ঞাত এবং অগম্য ছিল। কত শত ভ্রমণকারী, আবিষ্কারক ও ভৌগোলিক ঐ স্থানের সন্ধান করিতে যাইয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছেন—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? অবশেষে কিন্তু অসাধ্য সাধন হইয়াছে।

স্পীক (Mr. Speke) নামক জনৈক সাহেব ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নীলনদীর উদ্ভব-স্থলের সন্ধান করেন। ঐ অসমসাহসী সাহেব ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে **জাঞ্জিবার** হইতে স্থলপথে রওনা হ'ন এবং অসংখ্য দুর্গম গিরি-নদী-অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া—কখন কখন বা নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া—দীর্ঘ দুই বৎসর পরে স্বীয় উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করেন।

জগতের অনেক স্থানই এইভাবে মানুষের অজ্ঞাত বা অগম্য ছিল, কিন্তু ক্রমশঃই অসমসাহসী ব্যক্তিদের অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রতিভাবলে সেই সেই স্থান সুগম হইতেছে এবং তাহাদের বৈচিত্র্যও আর লোকচক্ষুর অগোচরে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিতেছে না।

চারিদিকের দৃশ্য দেখার সঙ্গে এই সব কথা ভাবিতেছিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নদীর বুকে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। পাখীরা আপন আপন বাসায় ফিরিতে লাগিল। আমরাও সাঁঝের আঁধার গাঢ় হইবার আগেই হোটেলের দিকে রওনা হইলাম।

নয়

সপ্ত-শৈল নগরে

নীলনদীর শোভা দেখার পর জিঞ্জা সহরে একটি রাত্র কাটাইলাম। পরদিন সকালবেলা আমরা সপ্ত-শৈল নগর বা কাম্পালার দিকে রওনা হইলাম। এইবার আমাদের ভ্রমণ সুরু হইল মোটরগাড়ীতে। জিঞ্জা আর কাম্পালার মাঝে কতটুকু আর পথ—মোটেই ত তিপ্পান্ন মাইল!

গাড়ী প্রথমতঃ একটু জোরেই চলিতে লাগিল। প্রাতঃকালে সামান্য কুয়াশা হইয়াছিল, কিন্তু খানিক পরেই কুয়াশাজাল ভেদ করিয়া সূর্য্যালোক ছড়াইয়া পড়িল। শিশিরসিক্ত সবুজ ঘাসের উপর সেই আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। বড় বড় কার্পাস-ক্ষেত্র সমূহের মধ্য দিয়া পথ—সেই পথে মোটরগাড়ী ছুটিয়া চলিল।

কতক্ষণ পরেই রাস্তার অদূরে এক স্থানে অনেক কাফ্রিকে একত্রে দেখা গেল। মনে হইল সেখানে বাজার বসিয়াছে। আমরা মোটর হইতে নামিয়া সেদিকে অগ্রসর হইলাম। বাস্তবিক সেখানে কার্পাস-তূলার বাজার বসিয়াছিল। আশে-

পাশের কাফ্রি-গ্রাম হইতে প্রভূত পরিমাণে তূলা সেখানে আমদানী হইয়াছিল।

উগাণ্ডা প্রদেশের অনেক স্থানেই ঐরকম তূলার বাজার আছে। সেই সব বাজার হইতে তূলা ক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীরা রেলওয়ের সাহায্যে সেগুলিকে মোম্বাসা বন্দরে চালান দেয়;

কার্পাস-তূলার বাজার

সেখান হইতে ষ্টীমার বোঝাই হইয়া সেই তূলা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ও পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানী হয়।

একমাত্র আমাদের ভারতবর্ষ ছাড়া, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর কোথায়ও উগাণ্ডা প্রদেশের মত তূলা উৎপন্ন হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঐ দেশে কৃষিজাত সম্পদের মধ্যে তূলাই সর্ব্বপ্রধান।

আজকাল পাটের বাজার মন্দা হওয়ায় যেমন আমাদের দুর্দ্দিন আসিয়াছে, ঐ দেশেও তেমনি তূলার দর কমিয়া গেলে লোকের কষ্টের অবধি থাকে না। পনের বৎসর আগের (১৯২১ খৃষ্টাব্দের) ঐ দেশের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব দৃষ্টে দেখা যায়—ঐ বৎসর যত কার্পাস-তূলা ও কার্পাস-বীজ বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার মোট মূল্য ১৩,০৩,৪৭০ পাউণ্ড—অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি টাকা !

ঐ তূলার বাজার ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে আমাদের মোটরখানি বিস্তীর্ণ ইক্ষুক্ষেত্র সমূহের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। রাস্তার দুই ধারেই বড় বড় ক্ষেত। তাহাতে কাফ্রি-চাষীরা কাজ করিতেছিল।

কতকগুলি ক্ষেতের পর একটা বিরাট কারখানা। জানিতে পারিলাম ঐ স্থানের নাম **লুগাজি** এবং উহা একটা চিনির কারখানা। ঐ কারখানায় ইক্ষুরস হইতে প্রচুর চিনি তৈয়ারী হয়। রস নিঙড়াইয়া লওয়ার পর ইক্ষুদণ্ডের নীরস ছিবড়াগুলিও অযথা নষ্ট না করিয়া, সেগুলিকে অন্যত্র চালান দেওয়া হয়। তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হয়।

জনৈক ভারতীয় হিন্দু ভদ্রলোক লুগাজি চিনির কারখানার মালিক। বিদেশে অত বড় একটা কারখানার মালিক একজন

ভারতবাসী—জানিতে পারিয়া, আমার মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল এবং ঐ প্রতিষ্ঠানটি দেখিবার লোভ সামলাইতে

কাফ্রিরা ইক্ষুক্ষেত্রে কাজ করিতেছে

পারিলাম না। কাজেই আমরা কারখানার ভিতরে গেলাম।

কারখানার কর্তৃপক্ষ তখন উপস্থিত ছিলেন না, প্রধান

কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তিনি খুবই অমায়িক লোক। খানিকক্ষণ আলাপ হইলে সুখনের সঙ্গে তাঁহার বেশ্ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। কথাবার্ত্তা হইতে প্রকাশ পাইল, উক্ত ভদ্রলোক সুখনদেরই জিলাবাসী। তিনি আমাদের খুব সমাদর করিলেন এবং স্বয়ং সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কারখানার বিভিন্ন অংশ দেখাইলেন।

চিনির কারখানার সঙ্গেই আর একটি ছোট কারখানা আছে; তাহাতে এল্‌কোহল, মেথিলেটেড্ স্পিরীট প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছিল। জানিতে পারিলাম কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে কারখানার চারিপাশের প্রায় নয় হাজার একর জমিতে আকের চাষ হইয়া থাকে। এত বড় বড় ইক্ষুক্ষেত্র আমি আর কখনও দেখি নাই। ঐ কারখানার পাশ দিয়াই জিঞ্জা-কাম্পালা রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে।

কারখানা দেখিবার পর আমরা আর কোথায়ও অপেক্ষা করি নাই। তা' সত্ত্বেও যখন আমরা কাম্পালার উপকণ্ঠে পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় বারটা বাজিয়াছে।

ঐ স্থান হইতে আমাদের নির্দ্দেশমত ড্রাইভার আস্তে আস্তে মোটর চালাইতে লাগিল; আমরা সহরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

ক্রমে রেল লাইন বামধারে ফেলিয়া বার্কলেজ ব্যাঙ্কের পাশ দিয়া বরাবর পশ্চিমদিকে চলিয়া—আমরা পোষ্ট-আফিসের নিকটবর্ত্তী হইলাম। সেখান হইতে খানিকটা উত্তরদিকে

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক; তাহার পার্শ্বের রাস্তা ধরিয়া সামান্য উত্তর-পশ্চিমদিকে যাইয়া আমরা হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সহরের দোকান-পসার ও আফিসগৃহ প্রভৃতির অবস্থান দেখিয়া চট্টগ্রাম সহরের কথা মনে পড়িল। আফিস-গৃহ, গীর্জ্জা প্রভৃতি পাহাড়ের কোলে স্তরে স্তরে সাজান। সেগুলিতে যখন সাঁঝের আলো জ্বলিয়া উঠে তখন বড়ই সুন্দর দেখায়।

সহরের অধিকাংশ দর্শনীয় জিনিষ সাতটি ছোট-বড় পাহাড়ের গায়ে স্থাপিত রহিয়াছে। এই জন্যই কাম্পালা সহরের অপর নাম 'সপ্ত-শৈল নগর'। ঐ পাহাড়গুলির নাম ও বিবরণ যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে ঃ—

(১) সহরের পশ্চিম-প্রান্তে নেমিরেম্বে পাহাড়; উচ্চতায় উহা অপর ছয়টি পাহাড় হইতে শ্রেষ্ঠ। উহার চূড়ায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে, দূরে দূরে অবস্থিত বহুবিঘা-বিস্তৃত কার্পাস ও ইক্ষুক্ষেত্রের আশেপাশে কদলীবৃক্ষ-শ্রেণীর সবুজ শোভা নয়নগোচর হয়। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টি করিলে—মনে হয় দূরস্থিত ভিক্টোরিয়া হ্রদের নীল জলরাশির কোলে সীমাহীন নীল আকাশ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে!

ঐ পাহাড়ের উপরে রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জা। শুনিলাম গীর্জ্জাটির অদৃষ্ট নেহাৎ মন্দ। কারণ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গীর্জ্জাটি প্রথম নির্ম্মিত হয়, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের

বিষম ঝড়ে তাহা ভূমিসাৎ হয়! পর বৎসর ঐ স্থানে গীর্জ্জা তৈয়ারী হয়, এবং মাত্র পাঁচ বৎসর পরেই বাজ পড়িয়া তাহাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তারপর অনেক দিন আর গীর্জ্জা তৈয়ারীর কোন চেষ্টাই হয় নাই। বর্ত্তমানে অবস্থিত সুন্দর গীর্জ্জাটির নির্ম্মাণ-কার্য্য মাত্র কয়েক বৎসর আগে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। উহার নিকটে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ দেশীয় নৃপতির কবর দেখা যায়।

(২) সহরের দক্ষিণপ্রান্তে মেঙ্গো পাহাড়। উহার উপরে
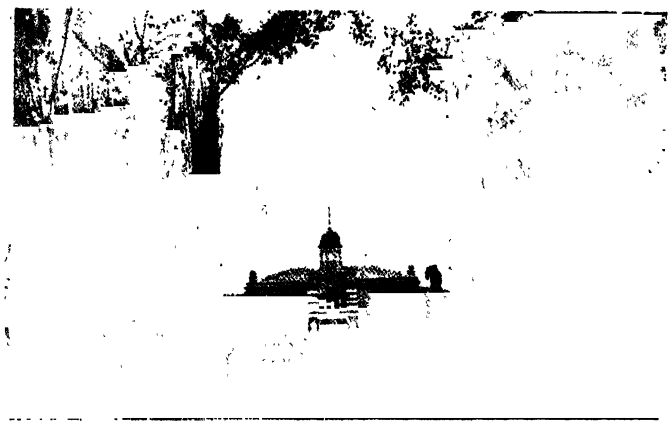
মেঙ্গো পাহাড়ের উপর দেশীয় রাজার প্রাসাদ

একজন দেশীয় রাজার প্রাসাদ। প্রাসাদটি নলখাগড়ার তৈয়ারী প্রাচীরে বেষ্টিত। দূর হইতে প্রাসাদটিকে বেশ্ সুন্দর দেখায়।

প্রাসাদের প্রধান প্রবেশ-দ্বারের পাশেই একটি অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে। শুনিতে পাইলাম পূর্ব্বকালে তথায় নরবলি হইত এবং তাহারই স্মৃতিরক্ষার্থ ঐ কুণ্ডে নিয়ত অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা হয়; কেবলমাত্র কোনও রাজার মৃত্যু হইলে ঐ অগ্নি সাময়িকভাবে নির্ব্বাপিত করা হয়।

পাহাড়ের সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে 'কিংস্ লেক' নামক পরিষ্কার জল বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র হ্রদ আছে।

(৩) পূর্ব্বোক্ত পাহাড়ের পশ্চিমে রুবাগা পাহাড়; তাহার চূড়ায় প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের গীর্জ্জা। উহার গঠন-পারিপাট্যও পূর্ব্বোক্ত গীর্জ্জার চেয়ে নিকৃষ্ট নহে।

পাহাড়টি বেশ্ খাড়া—উহার উপর পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচলের সুবিধা নাই। কথিত আছে ধর্ম্মভীরু দেশীয় খৃষ্টানগণ প্রত্যহ উপাসনা করিবার জন্য পাহাড়-চূড়ায় যাওয়ার সময়, পাকা গীর্জ্জা তৈয়ারীর জন্য যে যে জিনিষের আবশ্যক—যেমন ইট, বালি প্রভৃতি বহন করিয়া লইয়া যাইত এবং ঐ ভাবে সমস্ত জিনিষ জমা হইলে ঐ সুন্দর গীর্জ্জাবাড়ীটি তৈয়ারী হয়।

(৪) সহরের প্রায় মধ্যস্থলে কাম্পালা পাহাড়; তাহার উপর মিউজিয়াম্ এবং একটি পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে।

(৫) মুলাগো পাহাড়টির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ পাহাড়ের উপর 'মুলাগো হাসপাতাল'। হাসপাতালটির

বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে কাফ্রিরাও স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছে।

কাফ্রি নার্সদের কেশ-বিন্যাস

হাসপাতালে যাইয়া আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন ওয়ার্ড দেখিয়াছিলাম। শিক্ষার গুণে ও চর্চ্চার ফলে অজ্ঞাত, অখ্যাত

কাফ্রিরাও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে—সে সব দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়।

হাসপাতাল হইতে ফিরিবার সময় নার্সদের বিশ্রামাগারের বারান্দায় দেখা গেল যে, কয়েকজন কাফ্রি নার্স কেশ-বিন্যাস ও বেশভূষায় নিরত রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল তাহাদের গায়ের রং খুব কালো না হইলে এবং মুখাবয়বের সামান্য বিশেষত্ব না থাকিলে, তাহাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার বা বেশভূষা সুসভ্য মহিলাদের চেয়ে একেবারে নিকৃষ্ট নহে।

(৬) সহরের উত্তর সীমান্তস্থিত ম্যাকেরেরে পাহাড়ের উপর 'ম্যাকেরেরে কলেজ'। ঐ কলেজে স্থানীয় কাফ্রিদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুব্যবস্থা দেখিয়া মনে খুবই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।

(৭) ন্‌সাম্ব্যা হিল্ পাহাড়টি বেশি উচ্চ নহে। উহার উপর 'মিল হিল্ মিশন' নামক রোমান ক্যাথলিক মিশনারীদের বাসভবনসমূহ বিদ্যমান।

সপ্ত শৈলের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি দর্শনীয় জিনিষের কথা বলা হইল। ঐ সব ছাড়া দর্শনীয় জিনিষ হিসাবে হাইকোর্ট, ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, জেলখানা, ইউরোপীয় হাসপাতাল প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

সহরের রাস্তাগুলির মধ্যে বোম্বে রোড, জিঞ্জা রোড,

এন্‌টেবিব রোড, মেইন ষ্ট্রীট, সার্কুলার রোড, টার্নান এভেনিউ প্রভৃতি প্রধান।

সহরের বুকের উপর রেল লাইনের পাশ দিয়া 'নকিভুবো' নামে একটি ছোট নদীও প্রবাহিত হইতেছে। উহাকে নদী বলে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের অনেক খালও উহার চেয়ে বড়।

কাম্পালা পৌঁছিবার দুইদিন পরের কথা। বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা মিউজিয়াম্ দেখিয়া মেইন ষ্ট্রীট্ ধরিয়া হোটেলে ফিরিতেছিলাম। পথে উক্ত নদীর ধারে আসিয়া দেখিলাম, দুই-তিনজন কাফ্রি যুবক নদীতে মাছ ধরিতেছে।

কাম্পালা সহরে পাঁচদিন থাকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সব দেখা হইল। কাফ্রিদের চাল-চলন, আহার-বিহার ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগও সেখানে পাওয়া গিয়াছিল।

কাফ্রিরা অধিকাংশ সময় আটা ও শাক-সব্‌জী খাইয়া থাকে; মাছ-মাংসও উহাদের প্রিয় খাদ্য—সময় সময় উহারা পোকা-মাকড়ও ভাজিয়া খায়।

কাম্পালা হইতে আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম উগাণ্ডার রাজধানী এন্‌টেবিবর পথে।

দশ

উগাণ্ডার রাজধানীতে

"আজও আবার সেই হাতীর কথাই চল্‌ছে বুঝি ?"—বলিতে বলিতে সুখনলাল আসিয়া আসন গ্রহণ করিল।

আমরা যেই দিন কাম্পালা সহর ছাড়িয়াছিলাম, সেই দিনের কথা। ফাল্গুন মাসের দিন। সকালবেলা একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। হোটেলের খোলা বারান্দায় না বসিয়া ঘরের ভিতর বসিয়াছিলাম। পাশের চেয়ারে ছিলেন জনৈক সাহেব ; নিকটেই ছিল তাঁহার কাফ্রি অনুচর।

সাহেব একজন নামজাদা শিকারী। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের বেশি হইলেও তাঁহার সবল সুঠাম দেহকান্তি দেখিয়া তাঁহাকে নবীন যুবক বলিয়াই মনে হইয়াছিল। অন্যান্য জানোয়ার শিকারের চেয়ে তিনি হাতী শিকারেই বিশেষ আমোদ পান। উগাণ্ডা প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী **লেক এড্‌ওয়ার্ড** ও **লেক জর্জ্জ** নামক হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে হাতীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, কাফ্রি অনুচরটি সহ দুই দিন আগে তিনি কাম্পালায় পৌঁছিয়াছিলেন। আমরা যেই হোটেলে ছিলাম,

তিনিও সেই হোটেলেই আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পাশের কক্ষেই তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

পূর্ব্বদিন বৈকালে সাহেবের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। তাঁহার সদা-প্রফুল্ল মুখখানা দেখিয়া এবং তাঁহার অমায়িক আলাপ শুনিয়া, তিনি যে একজন শিকারী—তিনি যে নির্ম্মম-ভাবে প্রাণিহত্যা করিতে পারেন তাহা মনে হয় নাই।

পূর্ব্বসন্ধ্যায় তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল—তিনি প্রাণ খুলিয়া তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের বহু বিচিত্র কাহিনী আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া-ছিলাম, প্রায় পনের বৎসর আগে তিনি আমাদের দেশেও আসিয়াছিলেন; ব্রহ্মদেশ ও আসামের পাহাড়ে জঙ্গলে শিকার করিয়া—বাংলাদেশের উপর দিয়া তিনি নেপালে গমন করেন এবং সেখানে কয়েকটি হাতী শিকার করেন।

সেই দিনই আমাদের কাম্পালা ছাড়িবার কথা। সেই জন্যই পেটুক যেমন একত্রে প্রচুর খাবার পাইলে পরম তৃপ্তির সহিত তাহা উদরসাৎ করিতে উৎসুক হয়, আমিও সেইরূপ শিকারী সাহেবের নিকট হইতে হাতীর কাহিনী শুনিতে ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক তেমন সময় উপরি-উক্ত কথা কয়টি বলিতে বলিতে সুখনলাল ঘরে প্রবেশ করিল।

সাহেবের সঙ্গে আলাপের ফলে আমরা আফ্রিকার অনেক

তথ্য জানিতে পারিয়াছিলাম। যে বিরাট ভূ-খণ্ড শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া 'তিমিরাচ্ছন্ন মহাদেশ' নামে জগতে পরিচিত ছিল তাহা কি ভাবে—কোন্ কোন্ স্মরণীয় পুরুষের অসম-সাহসিকতার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাহেব তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। সেই সব কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনই হৃদয়গ্রাহী। ঐ সকল মহান্ আবিষ্কারকদের মধ্যে ডাক্তার লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যানলি, স্পীক, ব্যাকার, গর্ডন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাফ্রি শিকারী

সাহেব নিজে যেমন শিকারে পটু, তেমন তাঁহার অনুচরটিও। হাতীর চাল-চলন, জীবনযাত্রা প্রভৃতি বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। বন্য হাতী সম্বন্ধে—বিশেষ করিয়া আফ্রিকার হাতী সম্বন্ধে—তাহার নিকট অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম

আমাদের ভাগ্যক্রমে সে হিন্দী জানিত এবং হিন্দীতেই সেই সব কথা বলিয়াছিল।

তাহার নিকট হইতে যেই সব কথা শুনিয়াছিলাম তাহা বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভবপর নয়; তবে হাতীর সম্বন্ধে যে যে কথা বাস্তবিকই কৌতুককর কেবল সেই রকম কয়েকটি কথাই বলা হইতেছে—

"হাতী দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। সাধারণতঃ বিশ হইতে চল্লিশটি হাতী এক এক দলে থাকে; কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে—বিশেষতঃ এড্‌ওয়ার্ড হ্রদের তীরবর্ত্তী তৃণাচ্ছাদিত সমতল প্রদেশে, এক দলে একশত হইতে দেড়শত হাতীকেও বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছে। সেখানে কোন কোন জায়গায় তাহারা মাসাধিক কালও একত্রে থাকে।

হাতীদের পথচলার একটা বিশেষত্ব আছে। দলের প্রথম হাতীটি যে পথে যায়, পরবর্ত্তীগুলিও ঠিক সেই পথেই—এমন কি প্রথমটির পায়ের দাগে দাগে পা ফেলিয়া চলে। তাহাদের চলন-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, তাহারা বুঝি 'ফলো দি লীডার' নামক খেলার মহল্লা দিতেছে।

প্রত্যেক দলে যতগুলি মদ্দা হাতী থাকে, ঠিক ততগুলি মাদী হাতীও থাকে। তবে উহাদের মধ্যে এটা একটা রীতি যে, মাদী হাতীই দলের নেত্রীত্ব করে।

দলের প্রত্যেকটি হাতীর মধ্যে বেশ প্রীতির ভাব দেখা

যায়। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত বা দুর্ব্বল বাচ্ছা হাতীদিগকে সবল মদ্দা হাতীরা দল হইতে তাড়াইয়া দেয় না।

কোনও হাতী নিজ দলের নিয়ম ভঙ্গ করিলে, তাহাকে দস্তুরমত 'একঘরে' করা হয় এবং তেমন অবস্থায় ঐ দলচ্যুত হাতীর প্রকৃতি খুবই ভয়ঙ্কর হইয়া পড়ে; কাহাকেও দেখিতে পাইলে ঝোপ-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া হাতী তাহার দিকে তাড়া করিয়া চলে এবং পায়ে দলিয়া বা দাঁতের আঘাতে তাহাকে হত্যা করে। বলা বাহুল্য, সেই গুণ্ডা হাতীকে সুযোগমত গুলী করিয়া না মারিলে, নিকটবর্ত্তী লোকালয়ের শান্তি থাকে না।

আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ, গণ্ডার, মহিষ, জলহস্তী প্রভৃতির সঙ্গে হাতীকে বিচরণ করিতে দেখা গেলেও তাহাদের মধ্যে বৈরীভাব খুব কমই দৃষ্ট হয়। ধাড়ী হাতীগুলি তাহাদের বাচ্ছাগুলিকে এমন কৌশলে রক্ষা করে যে, সিংহ গণ্ডার প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত প্রাণীরা বাচ্ছাগুলির কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

আফ্রিকার হাতী ও ভারতীয় হাতীতে যে যে পার্থক্য আছে, তার মধ্যে কান ও দাঁতের পার্থক্যই বিশেষভাবে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আফ্রিকার হাতীর কান ও দাঁত ভারতীয় হাতীর কান ও দাঁতের চেয়ে ঢের বেশি বড়। ঐ সব দাঁতের জন্যই হাতী শিকার করা হয়; কারণ হাতীর দাঁতে নানা রকম মূল্যবান সৌখীন জিনিষ তৈয়ারী হয়।

সময় সময় আফ্রিকার জঙ্গলে একদন্ত হাতীও দেখা যায়।

অন্য হাতীর সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে বা গাছের পুরু ছালে খোঁচা মারিতে যাইয়া তাহাদের দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়।

সাধারণতঃ এক একটি দাঁত বিশ-পঁচিশ সের ওজনের হইয়া থাকে; কিন্তু একমণ, সোয়ামণ ওজনের গজদন্তও দুর্ল্লভ নহে; এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, আফ্রিকার কোনও হাতীর একটা মাত্র দাঁতের ওজন হইয়াছিল ২৩৫ পাউণ্ড বা প্রায় তিনমণ এবং উহা লম্বায় ছিল ৬ হাত ১৬ ইঞ্চি, আর উহার গোড়ার দিকের পরিধি হইয়াছিল ২৬ ইঞ্চি!! ঐরূপ ভারী গজদন্ত বিদেশে চালান দেওয়ার সময় জঙ্গলের মধ্য হইতে ট্রেন বা ষ্টীমারের কাছে নিতে কি কম কষ্ট হয়? ঐ ধরণের এক-একটা গজদন্ত বহন করিয়া নেওয়ার জন্য সময় সময় দুইজন করিয়া জোয়ান মজুরের আবশ্যক হয়।”

*　　*　　*　　*

শিকারীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বেলা বাড়িয়া গেল; কাজেই সকালবেলা আমরা কাম্পালা ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না। মধ্যাহ্নের আহার শেষ করিয়া কিছুকাল বিশ্রামের পর, আমরা শিকারী বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং মোটরে উগাণ্ডার রাজধানী এন্‌টেব্বির দিকে রওনা হইলাম।

কাম্পালা হইতে এন্‌টেব্বি মোটেই পঁচিশ মাইল—এক-ঘণ্টার মধ্যেই যাওয়া যায়, কিন্তু স্থানীয় দৃশ্যসমূহ দেখিবার সুবিধার জন্য মোটর আস্তে আস্তে চালান হইতেছিল। সেতুর

উপর দিয়া নকিভুবো নদী পার হইয়া মেঙ্গো হিল্ ও কিংস্ লেক-এর দক্ষিণদিক দিয়া পশ্চিমদিকে মোটর চলিতে লাগিল।

এন্‌টেব্বির পথে মোটরগাড়ী

তারপর ফোর্ট পোর্টেল হইতে যে রাস্তা কাম্পালার দিকে

আসিয়াছে, তাহার সঙ্গমস্থলে যাইয়া মোটর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোড় ঘূরিল।

রাস্তা বেশ্ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ; তাহার দুই ধারে নানা জাতীয় বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। তাহার পরে, দূরের কৃষিক্ষেত্রে কাফ্রিরা আপনমনে কাজ করিতেছিল ; কেহ কেহ মোটরের শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া রাস্তার দিকে চাহিল।

অপরাহ্নের ঈষদুষ্ণ সূর্য্যকিরণ বৃক্ষশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার উপর পড়িয়াছিল। সেই আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব সমাবেশের মধ্য দিয়া এন্‌টেবিবর পথে মোটরগাড়ী ছুটিয়া চলিল।

কাম্পালা ছাড়িবার পর তের মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা ভিক্টোরিয়া হ্রদের তীরবর্ত্তী একটি বিশিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানের প্রধান দর্শনীয় জিনিষ 'লুটেম্বে' (Lutembe) নামক একটা অতিবৃদ্ধ কুম্ভীর।

কুম্ভীরটি কত কাল যাবত ঐ স্থানে আছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কেবলমাত্র আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাসের কতক সময় পর্য্যন্ত উহাকে দেখা যায় না—তা' ছাড়া বৎসরের অবশিষ্ট সকল সময়ে কুম্ভীরটি ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানের অগভীর জলে বিচরণ করে।

স্থানীয় কাফ্রিরা কুম্ভীরটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিলেই তাহারা মাছ বা মাংসখণ্ড লইয়া জলের নিকটবর্ত্তী হয় ; আর দেখিতে দেখিতে

কুম্ভীরটিও জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং অগ্রসর হইয়া আহার্য্য বস্তুটি লইয়া যায়। স্থানীয় লোকের মুখে শুনা গেল—কুম্ভীরটি কাহারও কোন অনিষ্ট করে না।

আমাদের নির্দ্দেশমত একজন কাফ্রি কিছু খাবার লইয়া যখন নির্ভীকভাবে জলের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল তখন

লুটেম্বে খাবারের জন্য অগ্রসর হইতেছে

কুম্ভীরটি মন্থরগতিতে—অথচ কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা না করিয়া, খাবারের জন্য অগ্রসর হইল।

উহার সৎস্বভাবের অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম, তা সত্ত্বেও আমরা সভয়ে দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়াছিলাম; কারণ,

আমরা জানি কুম্ভীরেরা ভয়ানক হিংস্র প্রাণী, কিন্তু তেমন হিংস্র জলচরও কাফ্রি মুল্লুকের কোন্ মহর্ষির মহামন্ত্রে এমন অহিংসব্রত অবলম্বন করিয়াছে—তাহা কে বলিবে? জগতে এমন দৃশ্য বাস্তবিকই বিরল।

লুটেম্বের সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা করিতে করিতে
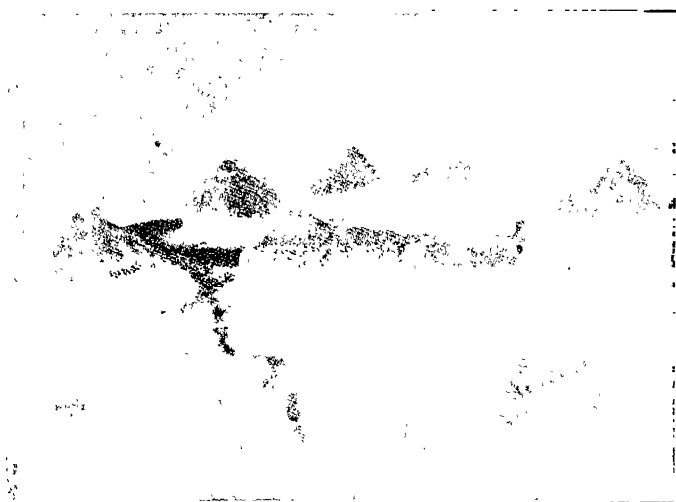
কাফ্রিদের বাড়ী

আমরা চলিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যাকালে এন্টেব্বি সহরে পৌঁছিলাম। এন্টেব্বি পৌঁছিবার পূর্ব্বে অন্য কোন বিষয়ে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করা সম্ভবপর হয় নাই। কেবল দূরে দূরে—উন্নত ভূ-খণ্ডের উপর কাফ্রিদের বাড়ীগুলির প্রতি

মাঝে মাঝে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যের সোনালী আলোতে কাফ্রিদের খড়-বিচালির তৈয়ারী অনুচ্চ ঘরগুলি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল।

ভিক্টোরিয়া হ্রদের দিকে বিস্তৃত—অন্তরীপের ন্যায় ভূ-খণ্ডের উপর এন্‌টেব্বি সহর অবস্থিত। সহরের রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত এবং উভয় পার্শ্ব বিভিন্ন বৃক্ষ-শোভিত। সহরের ইতস্ততঃ পুষ্পোদ্যানে পরিবেষ্টিত অনেক বাংলো রহিয়াছে; তাদের মাঝে মাঝে আছে তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত খোলা জায়গা। উগাণ্ডার ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তা ঐ সহরে বাস করেন।

সহরের দর্শনীয় জিনিষ হিসাবে গবর্ণমেণ্ট হাউস এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুই দিন পরে সন্ধ্যাব প্রাক্কালে আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঐ প্রদেশে যত রকম তরু-লতা ও পুষ্প জন্মে, ঐ গার্ডেনে তাহাদের একত্র সমাবেশ দেখিলাম। বিভিন্ন গাছপালা দেখার পর, এক লতাকুঞ্জে খানিকক্ষণ অবস্থান করিয়া আমরা ঐ দেশের নানারকম পাখীর সমবেত কলরব শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

এন্‌টেব্বি সহর উগাণ্ডার শাসন-কেন্দ্র হইলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যে কাম্পালা সহরের সমকক্ষ হইবে না। বাণিজ্যের জন্য কাম্পালা সহরের প্রতিপত্তি অনেক বেশি।

এগার

হ্রদের বুকে

"কি ভাই, নল-খাগড়ার শোভা দেখেই যে তুমি একেবারে মশ্‌গুল হ'য়ে গেলে!" বলিতে বলিতে সুখনলাল আসিয়া ষ্টীমারের রেলিং ধরিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল।

পূর্ব্ব হইতেই সুখনলালের প্রবল ইচ্ছা ছিল—ভিক্টোরিয়া হ্রদ প্রদক্ষিণ করিবে। তাই হ্রদ প্রদক্ষিণকারী ষ্টীমার আগমনের প্রতীক্ষায় দুই দিনেরও বেশি সময় এন্‌টেবিব বন্দরে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। যেই দিনের কথা বলা হইতেছে তৎপূর্ব্ব দিন এন্‌টেবিব বন্দর হইতে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া আমরা হ্রদের বুকে ভাসিয়াছিলাম।

ষ্টীমার স্বাভাবিক গতিতে চলিতেছিল; এন্‌টেবিবর পরবর্ত্তী **বুকাকাটা** ও **স্যাঙ্গো** বন্দর ছাড়িয়া ক্রমে উহা **বুকোবা** বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হ্রদের তীরস্থ শোভা বড়ই মনোরম। কোথায়ও তৃণগুল্মময় উচ্চ ভূভাগ ক্রম-নিম্ন হইয়া, একেবারে জলের সঙ্গে আসিয়া

মিশিয়াছে। সেই তৃণগুল্মের নানা রং-বেরঙের ছোট ছোট ফুলগুলি ঢেউয়ের তালে তালে হেলিতেছে—দুলিতেছে—নাচিতেছে। কোথায়ও নানা রকম জলচর পাখী আপনমনে জলক্রীড়া করিতেছে। তারপরই হয়ত বহু মাইল বিস্তৃত উপকূল-ভাগ জুড়িয়া 'পেপাইরস্' নামক নল-খাগড়ার বন।

তন্ময় হইয়া ঐসবের বিচিত্র শোভা দেখিতেছিলাম, ঠিক তেমন সময় পূর্ব্বোক্ত কথা কয়টি বলিতে বলিতে সুখনলাল আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল।

আফ্রিকার হ্রদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া হ্রদ বৃহত্তম, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। উহা সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গ অথবা ইউরোপের স্কটলণ্ডের সমান। উহার দৈর্ঘ্য ২৫০ মাইল, প্রস্থ প্রায় ১৫০ মাইল এবং পরিমাণ-ফল ২৬,৮২৮ বর্গ মাইল। উহার ১৮০০ মাইল দীর্ঘ উপকূল-রেখা মোটেই সরল নহে; স্থানে স্থানে জলভাগ ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি উপসাগরের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণেই উপকূল-রেখার দৈর্ঘ্য এত বেশি।

ভিক্টোরিয়া হ্রদ সমতল প্রদেশে অবস্থিত নহে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩,৭২৬ ফুট উচ্চ ভূভাগে অবস্থিত ঐ সুবিশাল হ্রদ ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

হ্রদের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ যেমন সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, তেমনি উহার জলও সুপেয়। সমগ্র পৃথিবীর পেয় জলের হ্রদ-সমূহের মধ্যে আমেরিকার সুপীরিয়র হ্রদ প্রথম, আর

ভিক্টোরিয়া হ্রদ দ্বিতীয় স্থানীয়। তেমন হ্রদের বুকে বেড়াইবার সুযোগ হওয়াতে মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল।

তখন সন্ধ্যা হওয়ার বেশি বিলম্ব ছিল না। পশ্চিম আকাশে লাল, নীল, হরিৎ, কালো প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের খেলা চলিয়াছিল। রং-বেরঙের ছোট ছোট মেঘখণ্ডে আকাশ আচ্ছন্ন
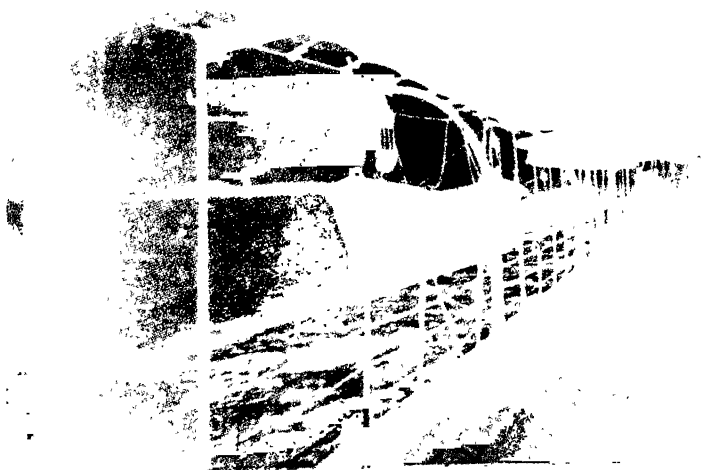
হ্রদের বুকে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য

হইয়াছিল। সেই সব মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে সূর্য্যদেব দিগন্তে ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন; আর তাহারই প্রতিবিম্ব জলে প্রতিফলিত হইয়া, তরঙ্গভঙ্গীতে হ্রদের বুকে অপরূপ আলোকবর্ম্মের স্বষ্টি করিয়াছে। সেই সৌন্দর্য্য-

রাশি নিরীক্ষণ করিয়া চোখ জুড়াইল—প্রাণে বিমল আনন্দ অনুভব করিলাম।

ষ্টীমারে নানা দেশীয় যাত্রী ছিল ; তার মধ্যে সাহেবই বেশি। জনৈক মধ্যবয়সী মিষ্টভাষী সাহেবের সঙ্গে আমাদের বিশেষ আলাপ হইয়াছিল। তিনি ছিলেন পর্য্যটক। পশ্চিম আফ্রিকায় কঙ্গো নদীর পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের পর, তিনি ফোর্ট পোর্টেল হইয়া কাম্পালার পথে **পোর্ট-বেল্** বন্দরে আগমন করেন এবং তথা হইতে ষ্টীমারে আরোহণ করেন। সন্ধ্যার পরে কেবিনে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে নানা গল্পগুজব করিতেছিলাম।

সাহেব কঙ্গো নদীর আশে পাশে বেড়াইয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে পিগ্‌মীদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলাম ; কারণ, আমরা জানি পিগ্‌মী নামক বামন কাফ্রিরা ঐ অঞ্চলে বাস করে। তাহাদের বিষয়ে অনেক কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটি বলা হইতেছে—

“সুদীর্ঘ কঙ্গো নদী (৩০০০ মাইল) ও তাহার উপনদীগুলি পশ্চিম আফ্রিকার যে যে অংশ দিয়া প্রবাহিত, সেই সব স্থান গহন বনে ঢাকা। সহস্র সহস্র বর্গ মাইল জুড়িয়া কেবল ঘন বন—বনের পর বন—আবার বন। সেই বন সীমাহীন—অবিচ্ছিন্ন। বড় বড় গাছের ডালপালা ও নিবিড় পত্রগুচ্ছে সেই স্থান এমনভাবে আচ্ছন্ন যে, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তীব্র আলোকও

বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কাজেই দিনের বেলায়ও ঐস্থানে অন্ধকার থাকে এবং বৎসরের প্রায় সকল সময়ে তথায় বৃষ্টি হয় বলিয়া ভূমি খুব সেঁৎসেতে। তেমন দুর্গম স্থানে পিগ্‌মীরা থাকে। তাহারা বামন—সাধারণতঃ তিন হাতের বেশি লম্বা হয় না।

নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালপালা ও লতাপাতা দিয়া ছোট ছোট কুড়েঘর তৈয়ার করিয়া, এক-একটি পিগ্‌মী পরিবার বাস করে। তাহারা চাষ-আবাদের ধার ধারে না। বিনাযত্নে মুক্ত প্রকৃতির কোলে যে সব ফল-মূল উৎপন্ন হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া এবং নানা রকম পশুপক্ষী শিকার করিয়া, তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সাপ, বেঙ, কেঁচো প্রভৃতি ছোট ছোট প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সুবৃহৎ হাতী পর্য্যন্ত তাহারা খাইয়া থাকে। ফলের মধ্যে কলা তাহাদের পরম প্রিয়; একই সময়ে পঞ্চাশ-ষাইটটি কলাও একজনে খাইতে পারে।

পিগ্‌মীদের শিকারের অস্ত্রের মধ্যে তীর-ধনু ও বর্শা প্রধান। তীর ছুঁড়িতে তাহারা খুবই ওস্তাদ। বিষাক্ত তীর ছুঁড়িয়া তাহারা হাতীর মত বড় বড় জানোয়ারকেও কাবু করিয়া ফেলে। তাহারা বিদেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে না; বিদেশী লোক দেখিলেই পলাইয়া যায়, কিন্তু পলাইয়া বেশি দূর যায় না—খানিক দূরে যাইয়াই বড় বড় গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকে এবং ঐ লোক নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহার প্রতি

বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে। তাহারা বামন জাতি হইলেও সাহসী ও বলবান্।

গান-বাজনাও তাহারা পছন্দ করে। সময় সময় জন কয়েক পিগ্‌মী মিলিত হইয়া ধনুকের ছিলায় তীরের ফলা দ্বারা অদ্ভুত শব্দ করিতে করিতে—অপরূপ ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া থাকে।”

... ...

নানা দেশে ঘুরিয়া সাহেব যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে-ছিলেন, তেমনি নূতন নূতন দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তুর ছবিও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গল্প করিতে করিতে তাঁহার ছবির এল্‌বামখানিও নাড়াচাড়া করিতেছিলাম। তাহার মধ্যে কঙ্গো নদীর বিভিন্ন প্রপাত ও উহার তীরস্থ নিবিড় বনের ছবি, কঙ্গো দেশীয় কাফ্রিদের ঘরবাড়ী, পিগ্‌মীদের কুড়েঘর প্রভৃতির ছবিগুলি ছিল একেবারে নিখুঁত।

কঙ্গোদের ঘরগুলি আমাদের দেশের এক-একটি মঠের মত দেখায়। কঙ্গোরা লম্বা লম্বা বাঁশ বা গাছের বড় বড় ডাল বৃত্তাকারে পুতিয়া লয়, তারপর তাহাদের অগ্রভাগগুলি একত্র করিয়া শক্ত লতা দিয়া বাঁধিয়া এবং তাহার উপর খড়, পাতা প্রভৃতি দিয়া ঐ মঠের মত ঘর তৈয়ার করে। ঐ ধরণের কতকগুলি ছোট-বড় ঘর একসারিতে পাশাপাশি সাজানো থাকিলে না জানি কেমন সুন্দর দেখায়!

ছবি দেখার পর আরও গল্প-গুজব করিতে করিতে অধিক

রাত্রিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে বুকোবা বন্দরে ষ্টীমার ভিড়িল। বুকোবা ট্যাঙ্গানিকা দেশের বন্দর।

কেনিয়া, উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানিকা এই তিনটি দেশের সীমায়
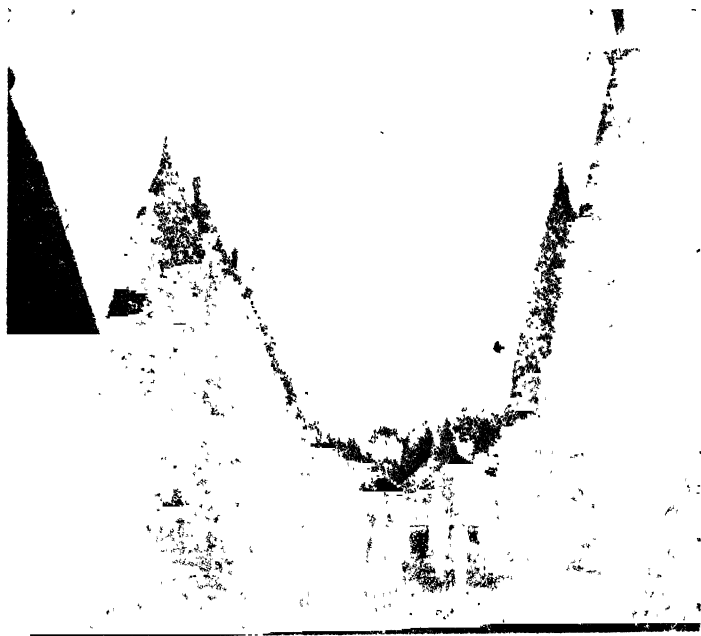
কঙ্গোদের বাড়ী

ভিক্টোরিয়া হ্রদ অবস্থিত। উহার তীরস্থ বন্দর জিঞ্জা, পোর্ট-বেল্, এন্‌টেবিব, বুকাকাটা ও স্যাঙ্গো—উগাণ্ডার মধ্যে; বুকোবা, মোয়াঞ্জা ও মুসোমা বন্দর ট্যাঙ্গানিকা দেশে, আর করুঙ্গু ও
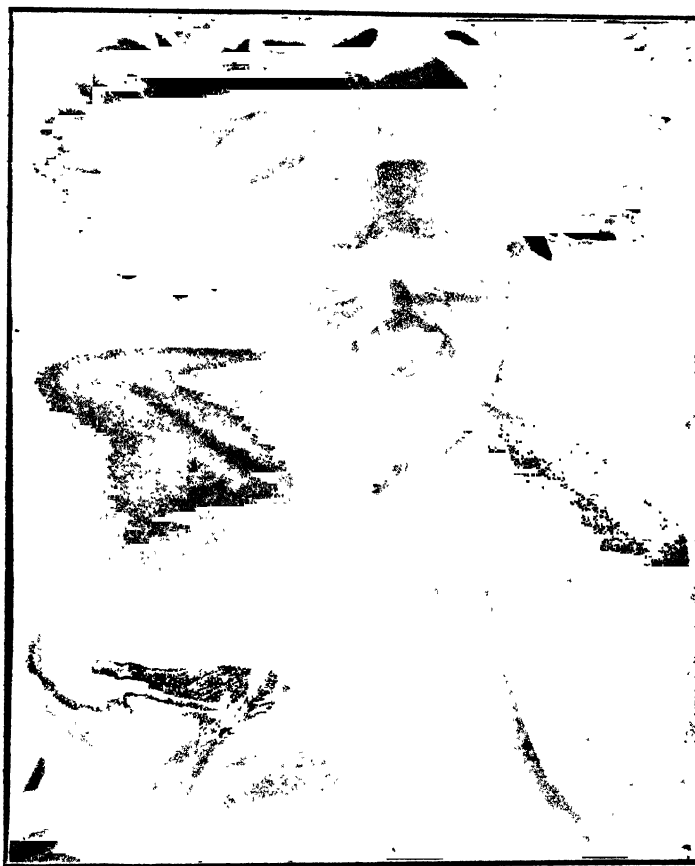
কাফ্রি-নায়ক

পোর্ট ফ্লোরেন্স বন্দর কেনিয়া উপনিবেশের অন্তর্গত। পোর্ট ফ্লোরেন্সের বর্ত্তমান নামই কিসুমু।

বুকোবার ষ্টীমারঘাটে কয়েকজন যাত্রী উঠা-নামা করিল। বহু কাফ্রিকেও ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। কিছুদূরে কতকগুলি বেশ্ হৃষ্টপুষ্ট কাফ্রির মধ্যে একজনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল; কারণ তাহার মাথায় ছিল এক অদ্ভুত রকমের টুপি।

ঐ বলিষ্ঠ কাফ্রিদের সম্বন্ধে পর্য্যটক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, ঐ কাফ্রিরা ট্যাঙ্গানিকা দেশের পশ্চিমস্থ বেলজিয়ান কঙ্গো দেশের উত্তর-পশ্চিমদিকে বাস করে। তাহারা খুব দুর্দ্দান্ত এবং হিংস্রস্বভাব। পাখীর পালক ও গাছের ছালে তৈয়ারী অদ্ভুত টুপি যাহার মাথায় আছে, সেই লোকটিই দলের নায়ক। কোন্ খেয়ালের বশে তাহারা নিজেদের গণ্ডী ছাড়িয়া হ্রদের তীরবর্ত্তী হইয়াছিল তাহা কে বলিবে?

বুকোবা বন্দর ছাড়িয়া ষ্টীমার পরদিন **মোয়াঞ্জা** বন্দরে পৌঁছিল। হ্রদের উত্তর তীরস্থ এন্‌টেবিব বন্দরের ন্যায় দক্ষিণ তীরের মোয়াঞ্জা বন্দরও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী।

মোয়াঞ্জা বন্দর পিছনে ফেলিয়া, ষ্টীমার একে একে **মুসোমা** ও **করুঙ্গু** বন্দর ধরিয়া কিসুমুর পথে চলিয়াছিল।

হ্রদের বুকে ছোট ছোট অনেক দ্বীপ রহিয়াছে। নানা জাতীয় ছোট-বড় গাছ, সবুজ ঘাস ও পেপাইরস্ নামক

নল-বনে সেই সব দ্বীপ সমাচ্ছন্ন। তাহাদের পার্শ্ব দিয়া ষ্টীমার চলিবার সময় সেই সবুজ দ্বীপগুলিকে চলন্ত বলিয়া মনে হয়।

একটা দ্বীপের পাশে অনেক কুম্ভীরকে সারি সারি পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল; বোধ হয় তাহারা কূলে উঠিয়া রোদ পোহাইতে পোহাইতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দূর হইতে দেখিয়া মনে হইল বুঝি বা কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড জলের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের নিকট দিয়া ষ্টীমার চলিবার সময়, ঢেউয়ের আঘাতে তাহাদের ঘুম টুটিয়া গেল; অমনি তাহারা ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

গাং-চিল ও অন্যান্য অনেক পাখী ষ্টীমারের পাশে ঘূরাফিরি করিয়া আপন আপন আহার সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল।

ক্রমেই আমরা কিস্থুমু বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। কিস্থুমু হইতে রওনা হইয়া ষ্টীমার আবার সেই কিস্থুমুতেই ফিরিয়া আসিল! সমগ্র হ্রদটি প্রদক্ষিণ করিতে উহার মোট পাঁচদিন লাগিয়াছিল। কিন্তু আমরা ঐ পাঁচদিনই ষ্টীমারে ছিলাম না; কারণ আমরা ষ্টীমারে উঠিয়াছিলাম এন্টেব্বি হইতে।

কবিরোণ্ডো উপসাগরের মধ্য দিয়া ষ্টীমার আস্তে আস্তে বন্দরে প্রবেশ করিল। সেই সময় সম্মুখে তাকাইয়া দেখিলাম, ষ্টীমারঘাট হইতে হ্রদের তীর ধরিয়া এক সুপ্রশস্ত রাস্তা চলিয়া

গিয়াছে। রাস্তাটি বড় সুন্দর। তাহার এক পার্শ্ব বড় বড় বৃক্ষে পরিশোভিত, আর অপর পার্শ্ব হ্রদের সফেন তরঙ্গমালায় বিধৌত।

ষ্টীমার নিশ্চলভাবে দাঁড়াইবার আগেই আরোহীদের নামিবার জন্য খুবই ব্যস্ততা সুরু হইল। অল্পক্ষণ পরে পর্য্যটক বন্ধুটিকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া, আমরাও ষ্টীমার হইতে নামিয়া আসিলাম।

কিস্থমু সুন্দর সহর। কেনিয়া-উগাণ্ডা রেল লাইন কাম্পালা হইয়া ভিক্টোরিয়া হ্রদের তীরস্থ অন্যতম বন্দর পোর্ট-বেল্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার আগে, উহার প্রান্তবর্ত্তী ষ্টেশন ছিল ঐ কিস্থমু। তখন বিশাল হ্রদের তীরস্থ প্রদেশসমূহের বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য—তূলা, কোকো, কাফি, রবার প্রভৃতি ষ্টীমার বোঝাই হইয়া কিস্থমু বন্দরে পেঁাছিত এবং সেখান হইতে মোম্বাসার পথে নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। রেল লাইনের বিস্তৃতিতে কিস্থমু বন্দরের পূর্ব্বের প্রতিপত্তি অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

কিস্থমু সহরের দর্শনীয় স্থান হিসাবে রেলওয়ে-কারখানা ও 'ডক্' (dock) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বার

আবার নাইরোবিতে

কিস্‌মু সহরে দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন সকালে সুখন বলিল,—"আর নয় ভাই, এখন আপন-ঘরে ফিরে চল। আজই আমরা রওনা হ'ব।"

আমি বলিলাম,—"কেন ভাই, এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

সুখন একখানা টেলিগ্রাম দেখাইয়া বলিল,—"আমার চিঠি পেয়েই বাবা এই টেলিগ্রাম ক'রেছেন বাসায় ফের্‌বার জন্যে। তাঁর হুকুম অমান্য কর্‌বার যো নেই। দেরী কর্‌লে খুবই বিরক্ত হবেন।"

কাজেই আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন-পর্ব্ব সুরু হইল। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া, অপরাহ্ণ দেড়টার সময় আমরা ট্রেনে আরোহণ করিলাম। পূর্ব্বের কয়েকদিন মোটরে ও ষ্টীমারে ভ্রমণ করার পর ট্রেনে ভ্রমণ ভালই লাগিতেছিল। উঁচু-নীচু পথে মাঝে মাঝে অনুচ্চ গিরিশৃঙ্গের মধ্যবর্ত্তী খিলান-করা সেতু বা ভায়াডাক্টের উপর দিয়া মন্থরগতিতে ট্রেন চলিতেছিল।

পথের পার্শ্বের শোভা খুবই মনোরম। কোথায়ও বিরাট বাঁশঝাড়, কোথায়ও সুদীর্ঘ দেবদারু গাছের শ্রেণী, তার পরই আবার বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র—তাহাতে কাফ্রিরা আপনমনে কাজ করিতেছে। তাহাদের সবল সুঠাম দেহে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

কাফ্রি-মুল্লুকে যে-কত দিন ছিলাম, রুগ্‌ণ লোক খুব কমই দেখিয়াছি। নিয়ত প্রকৃতির সবুজ শোভার মাঝে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া, পোষাক-পরিচ্ছদের বাহুল্য-বর্জ্জিত আড়ম্বর-হীন জীবন যাপন করে বলিয়াই বোধ হয় উহারা এমন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী।

পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই ট্রেন নকুরু ষ্টেশনে থামিল। নকুরু সহরের কথা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে। নকুরু হ্রদের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু পূর্ব্ববারের মত ফ্ল্যামিঙ্গোর বহর দেখা গেল না।

কতক সময় পরে গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। ক্রমে আরও দুইটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আমরা গিল্‌গিল্ জংশনে পৌঁছিলাম।

নকুরু ও গিল্‌গিল্ ষ্টেশনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ৩৯ মাইল, কিন্তু যেস্থানে গিল্‌গিল্ ষ্টেশন, নকুরু হইতে সেইস্থান প্রায় ৫০০ ফুট উন্নত। আবার উহারই ১৮ মাইল পরবর্ত্তী **নাইবাসা** ষ্টেশন প্রায় ৩৫০ ফুট নিম্ন ভূভাগে অবস্থিত। ইহা হইতে

বেশ্ বুঝা যায়, কিরূপ তরঙ্গায়িত ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া রেল লাইন বিস্তৃত।

মধ্যাহ্নের পরে আমরা নাইবাসা পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের পশ্চিমদিকে নাইবাসা হ্রদ। উহা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় বার মাইল দীর্ঘ, কিন্তু উহার গভীরতা এখনও নির্ণীত হয় নাই।
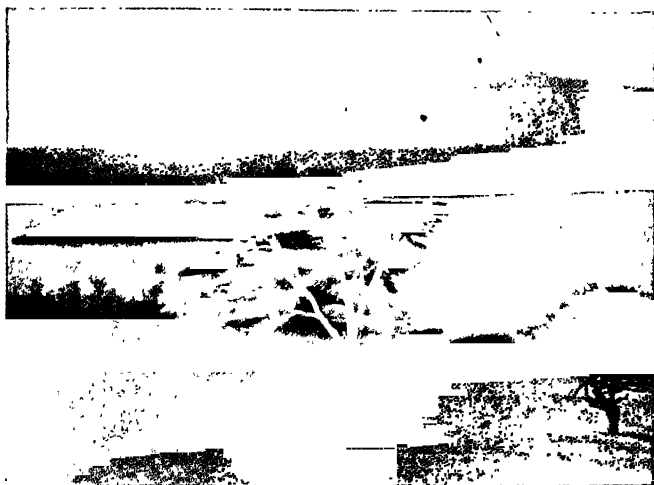
নাইবাসা হ্রদ ও লঙ্গোনট্ গিরির দৃশ্য

ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের অভিমত এই যে—প্রাচীনকালে ঐস্থানে আগ্নেয় পর্ব্বত ছিল। কালক্রমে উহা নির্ব্বাপিত হইয়া তাহার ৮০ বর্গ-মাইল পরিমিত বিশাল মুখগহ্বরে ঐ হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে; কাজেই উহার মধ্যস্থানের গভীরতা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

হ্রদের বুকে—মধ্যস্থানের একপাশে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দ্বীপ আছে। নির্ম্মল জলরাশির কোলে সবুজ বৃক্ষলতায় শোভিত ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। কয়েক ক্রোশ দূরে লঙ্গোনট্ নামক নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরিটিকেও দেখা যাইতেছিল। পরিষ্কার দিবালোকেও উহাকে কুয়াশাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল।

হ্রদের কূলে অসংখ্য বন্য হাঁস চরিতেছিল। মৃদু বায়ুভরে হ্রদের বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল, আর তাহাতে উজ্জ্বল সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হওয়ায় গলিত রৌপ্য-প্রবাহের ন্যায় দেখাইতেছিল।

গাড়ীতে বসিয়া হ্রদের শোভা দেখিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম জনৈক কাফ্রি তিন-চারিটি মাছ লইয়া আস্তে আস্তে গাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছে। তাহার পিছনেই ছিপ হাতে দুইজন সাহেব।

মাছগুলি বেশ্ সুন্দর। উহাদের গায়ের রং লালাভ শাদা এবং সারা গায়ে কালো কালো দাগ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঐ মাছের নাম 'রেইনবো ট্রাউট্' (Rainbow trout)। নাইবাসা হইতে চারি-পাঁচ মাইলের মধ্যে মোরেন্‌ড্যাট্ নামে যে ছোট নদী আছে, তাহাতে ঐ মাছ যথেষ্টই পাওয়া যায়।

নাইবাসা ছাড়িয়া গাড়ী ক্রমোন্নত পথে যাইতে যাইতে **এস্‌কার্প্‌মেণ্ট** ষ্টেশনের পর পুনঃ ক্রম-নিম্ন পথে চলিল।

নাইবাসা ষ্টেশনের পর হইতে পথের পার্শ্বে বড় বড় বাঁশবন দেখিলাম ; কিন্তু **লিমুরু** ষ্টেশনের পর হইতে নাইরোবি পর্য্যন্ত বাঁশবনের বদলে কেবল কাফিক্ষেত্রসমূহ দেখা যাইতেছিল।
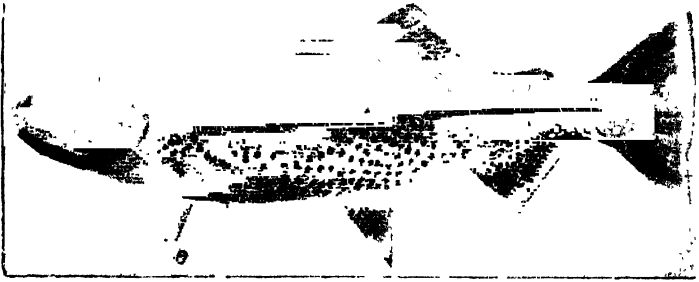
রেইনবো-ট্রাউট্

এইভাবে চলিতে চলিতে বৈকালে ৪টার সময় আমরা নাইরোবি আসিয়া পৌঁছিলাম।

আমাকে পাইয়া মামাবাবু, মামীমা ও ভাই দুইটির আনন্দের সীমা রহিল না। ভ্রমণ সম্বন্ধে নানারকম আলাপ-আলোচনায় দিনগুলি বেশ্ কাটিতে লাগিল।

তের

মাসাইদের দেশে

পনের দিন পরের কথা। বৈকালবেলা সুখন ও আমি বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। এদিক্ সেদিক্ ঘুরাফিরির পর, গবর্ণমেণ্ট রোড্ ধরিয়া খানিকটা উত্তরদিকে যাইয়া—নাইরোবি নদীর উপরস্থ পুলের উপর বসিলাম। বেড়াইতে বাহির হইলে আমরা প্রায়ই ঐ স্থানে যাইতাম। ঐ পুলের মাত্র কয়েক গজ পশ্চিমে রেল লাইন। সেখানেও আর একটি পুল। পুলের উপর দিয়া ট্রেন চলিলে বেশ্ সুন্দর দেখায়।

আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম তাহার খানিকটা দক্ষিণে স্কটিশ গীর্জ্জা। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গীর্জ্জায় ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল। ঢ-ঙ্—ঢ-ঙ্ করিয়া ক্রমে ছয়টি শব্দ হইল; বুঝিলাম ছয়টা বাজিল, শীঘ্রই সাঁঝের আঁধার ঘনাইয়া আসিবে।

নানারকম কথাবার্ত্তার পর সুখনলাল বলিল,—"তুমি ত ভাই শীঘ্রই দেশে ফিরে যাবে, আমিও তোমার সাথেই একবার দেশে যাবার চেষ্টা কর্‌ব। তার আগে একবার জন্তু-জানোয়ারে

ভরা—মাসাই কাফ্রিদের দেশে ঘূ্রে আসা যাক্। বাবা এখন এখানে নেই, দাদা বিশেষ আপত্তি কর্‌বেন না। এমন সুযোগ ছাড়া যায় না, কি বল ?"

আমি বলিলাম,—"ছাড়া ত উচিত নয়। তবে——"

আমার কথা শেষ না হইতেই সুখন বলিল,—"তবে আবার কি ? এবার আর খরচ কি ? যা'ব নিজেদের মোটরে—খাবার জিনিষও যতটা সম্ভব, সঙ্গেই নিয়ে যা'ব। প্যাট্রোল-খরচ ছাড়া আর বিশেষ কিছু খরচ নেই। তুমি প্রস্তুত থেকো—পরশু আমরা যাত্রা কর্‌ব।"

বলা বাহুল্য, তাহার প্রস্তাবে আমাকে সায় দিতে হইল।

*   *   *   *

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা রওনা হইলাম। নাইরোবির সীমানা ছাড়িয়া গাড়ী ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিল এবং এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই উহা মাসাই রিজার্ভের নিকটে পোঁছিল।

স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা মনোরম। লম্বা লম্বা সবুজ ঘাসে ভরা সমতল প্রান্তরের মাঝে মাঝে তৃণময় মাঠ,—আবার তার পরই নানা রকম গাছে ভরা বিস্তীর্ণ জঙ্গল। সেই সব জঙ্গলে ও প্রান্তরে জেব্রা, জিরাফ, উটপাখী, বাষ্টার্ড-পাখী, শূকর, শিয়াল, বন্য কুকুর এবং ইল্যাণ্ড, ইম্পালা প্রভৃতি নানা জাতীয় ছোট-বড় হরিণ ইতস্ততঃ ঘূ্রিয়া বেড়াইতেছিল ;—

দেখিয়া মনে হইল, উহাই প্রকৃতির আসল চিড়িয়াখানা! জানোয়ারদের কতক দলে দলে চরিয়া বেড়াইতেছিল, কেহ নির্ব্বিকারভাবে ঝোপের ধারে শুইয়াছিল, আবার কেহ বা অন্যকে আক্রমণ করিতেছিল—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে রাস্তার নিকটেই কতকগুলি বিভিন্ন বয়সের মাসাই কাফ্রিকে বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। তাহারা মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল।

আমরা মোটর থামাইয়া, তাহাদের অলক্ষ্যে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম—ঢাল ও বর্শা হাতে বহু মাসাই ঐ জায়গায় মণ্ডলাকারে বসিয়া আছে। তাহারা কখনও কখনও ঢালের উপর বর্শার হাতলের আঘাত করিয়া অদ্ভুত বাদ্য করিতেছে, আর অন্য একজন—সম্ভবতঃ উহাদের সর্দ্দার—সকলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ঐ অদ্ভুত বাদ্যের তালে তালে অভিনব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে। অদূরে একটি মৃত সিংহ বর্শা-বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সুখন বলিল যে, মাসাইরা সিংহ শিকার করিয়া নৃত্য-গীত সহকারে ঐরূপ উৎসব প্রায়ই করিয়া থাকে।

মাসাই কাফ্রিরা বেশ্ সাহসী ও বলবান্। তাহাদের এতই সাহস যে, আত্মরক্ষার জন্য একটি মাত্র বর্শা হাতে করিয়া, তাহারা হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ জঙ্গলে বিচরণ করে এবং সিংহের ন্যায় জানোয়ারকেও তাহারা বর্শা দ্বারা কাবু করিয়া ফেলে।

মাসাইদের সিংহ-শিকারে আনন্দোৎসব

মাসাইরা পূর্ব্বে খুবই দুর্দ্দান্ত ও হিংস্রপ্রকৃতি ছিল, কিন্তু এখন তাহাদের হিংস্র স্বভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে

মাসাই যুবক ও তাহার স্ত্রী

উহাদের উৎসবের সম্বন্ধে গল্পগুজব করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। মোটরখানি আস্তে আস্তে চলিতেছিল। খানিক

পরেই দেখিলাম একটি মাসাই যুবক ও তাহার স্ত্রী আপন কাজে চলিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল উহারা নব-বিবাহিত।

উহাদের বিবাহের বিষয় কিছু কিছু জানিতে খুব কৌতূহল হইল। আমাদের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, আমাদের দেশের ন্যায় সেই দেশেও বিবাহে পণপ্রথার প্রচলন আছে—তবে উভয় দেশের প্রথায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেশে নগদ টাকা, সোনার গয়না অথবা বরের 'সাত সমুদ্র তের নদী পার' বিলাতে যাইয়া শিক্ষালাভের খরচ—বরপণ হিসাবে দিতে হয়। কোন কোন সম্প্রদায়ে মেয়ের পণও আছে, তবে বরপণের চেয়ে উহার প্রাবল্য কম।

ঐ দেশে কিন্তু বরের জন্য পণ দিতে হয় না, কেবল মেয়ের পিতা বা অভিভাবক পণ হিসাবে বরের নিকট হইতে কয়েকটি গরু, ছাগল এবং কয়েক পিপা মদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

ড্রাইভার আরও বলিল যে, ঐ সুন্দরী স্ত্রী লাভের জন্য মাসাই যুবকটিকে হয়ত পনের-ষোলটি গরু-ছাগল এবং অন্ততঃ কুড়ি পিপা মদ তাহার শ্বশুরকে দিতে হইয়াছে।

তাহার কথা শুনিয়া হাসি পাইল। মাথায় চুলের লেশ নাই—গালের হাড় উঁচু হইয়া আছে; হাতে গলায় কানে ভারী ভারী লোহার গয়না—সে নাকি আবার সুন্দরী!

শেষে জানিতে পারিয়াছিলাম—মেয়েদের মাথায় চুল না থাকা এবং গয়নার বাহুল্যই উহাদের সৌন্দর্য্যের বিশিষ্ট অঙ্গ।

দেশভেদে ও জাতিভেদে মানুষের সৌন্দর্য্যজ্ঞান যে বিভিন্ন হইয়া থাকে তাহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে।

চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা চলিলাম।
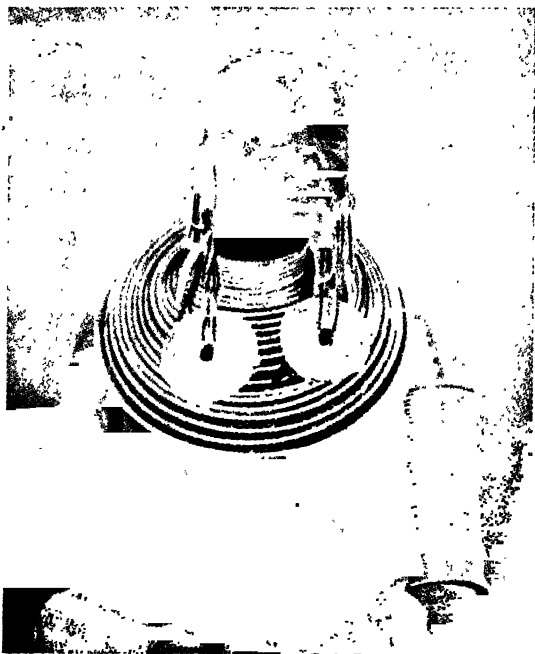
মাসাই সুন্দরী

মধ্যাহ্নের পরে আমরা **কাজিয়াডো** সহর পিছনে ফেলিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলাম। কেনিয়া-উগাণ্ডা রেল লাইনের

কোঙ্গা জংশন হইতে ৯১ মাইল দীর্ঘ যে শাখা লাইনটি **মাগাডি হ্রদ** পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহারই পাশে উক্ত কাজিয়াডো সহর।

মাগাডি হ্রদটি যেন এক বিরাট সোডার খনি। উহাতে কত সোডা যে উৎপন্ন হয় তাহা বলা যায় না। 'মাগাডি সোডা কোম্পানী' সেই সোডা সর্ব্বত্র চালান দিয়া থাকে। একমাত্র ঐ সোডা চালানের সুবিধার জন্যই রেল লাইনটি প্রস্তুত হইয়াছে।

ক্রমশঃ চলিতে চলিতে আমরা **নমাঙ্গা** সহরের উপকণ্ঠে যাইয়া পৌঁছিলাম। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। তখন আরও বিভিন্ন জানোয়ার দেখা গেল।

নমাঙ্গা সহরের কয়েক মাইল উত্তরে বিরাট বন। সেই বন নমাঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত রাস্তা।

সন্ধ্যা সময়ে যদিও অন্ধকার তেমন গাঢ় হয় নাই, তথাপি সেই হিংস্র জন্তুর আস্তানার ভিতর দিয়া যাইতে মনে বেশ্ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। রাস্তার অদূরে বনের ধারে দুই-একটি হাতীর দলও চোখে পড়িয়াছিল। তাহারা বোধ হয় কোনও জলাশয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল।

যাহা হউক, আমরা সেই বন্য পথে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি মোটর চালাইয়া—কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহরে পৌঁছিলাম এবং রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

চৌদ্দ

জানোয়ারের মেলায়

নমাঙ্গা সহরে একটা রাত্রি কোন রকমে কাটিল। রাত্রি শেষ হইতে না-হইতেই আমরা পুনরায় রওনা হইলাম। যথেষ্ট পরিমাণ খাবার দ্রব্য, প্যাট্রোল এবং আত্মরক্ষার উপকরণ হিসাবে দুই-তিনটি বর্শাও সঙ্গে লওয়া হইল।

রাত্রি প্রভাত হইলেও চারিদিক তখনও পূরাপূরি ফর্সা হয় নাই। পূর্ব্বাকাশে নানারকম রঙের খেলা চলিতেছিল; তাহাতে বুঝিতে পারিলাম সূর্য্যোদয়ের বেশি দেরী নাই। চারিদিকের ঝোপ-জঙ্গল হাল্‌কা কুয়াশাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আব্‌ছা অন্ধকার দেখাইতেছিল। তেমন সময় বন্য পথের মধ্য দিয়া চলিতে বেশ্‌ আরাম লাগিতেছিল—অবশ্য নিশাচর জানোয়ারদের পাল্লায় পড়িবার আশঙ্কায় মনের কোণে একটু একটু ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছিল।

সুখনের হাবভাবে ভয় বা ভাবনার চিহ্নটুকুও দেখা গেল না। ভাগ্যবলে সুখনের মত সাহসী ও উদারপ্রাণ বন্ধু মিলিয়াছিল; নতুবা শত শত মাইল দূরবর্ত্তী অজানা-অচেনা দেশে—বিভিন্ন

প্রকৃতির মানবের আচার-ব্যবহার এবং হিংস্র-অহিংস্র বহু জন্তু-জানোয়ার পর্য্যবেক্ষণ করা কখনই সম্ভবপর হইত না।—বড় জোর মামা-মামীর আদর-সোহাগের আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া নাইরোবি ও মোম্বাসার স্মৃতি বুকে লইয়াই দেশে ফিরিয়া আসিতাম।

নমাঙ্গা সহর কেনিয়া উপনিবেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত; তার পর হইতেই ট্যাঙ্গানিকা দেশ। নমাঙ্গা ছাড়িয়া আমরা **মারুঙ্গুর** দিকে রওনা হইলাম। মাইল খানেক পথ যাওয়ার পরই অদূরে একদল বন্য মহিষ দেখা গেল।

মোটরের শব্দ শুনিয়া দলের তিন-চারিটি মহিষ সন্ত্রস্তভাবে মাথা উঠাইয়া আমাদের দিকে চাহিল; দেখিয়া মনে হইল বুঝি বা তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে মোটর অনেক দূর চলিয়া গেল।

আমাদের দেশে মহিষকে গাড়ী বা লাঙ্গল টানিতে আমরা প্রায়ই দেখি। তাহাদিগকে বেশ্ শান্ত-শিষ্ট নিরীহ প্রাণী বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু আফ্রিকার বন্য মহিষ খুব সাংঘাতিক প্রাণী—সিংহ, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতির মত উহারাও খুব হিংস্র-প্রকৃতি। উহারা রাত্রিকালে দল বাঁধিয়া চরিতে বাহির হয়।

ক্রমেই বেলা বাড়িতে লাগিল। আমরা দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলাম। পথের আশে পাশে অনেক বাওবাব গাছ; আর গাছের ছায়ায় অনেক হরিণ ও হরিণশিশু দেখা গেল।

তাহাদের কোন কোনটি মোটরের শব্দ শুনিয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছে,—বাচ্ছারা ধাড়ীগুলির সঙ্গে তাল রাখিয়া
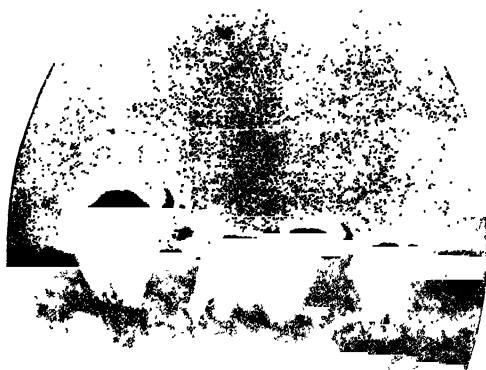
বন্য মহিষ

চলিতে পারিতেছে না; আবার কোনটি যেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া মোটরের দিকে চাহিয়া আছে।

আমাদের দেশে নারিকেল গাছের প্রত্যেকটি জিনিষ—

কাণ্ড, পত্র, ফল, শাঁস প্রভৃতি সবই মানুষের প্রয়োজনীয়। কাফ্রি-মুল্লুকের বাওবাব গাছের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ।

বাওবাব গাছের ফলের বীজ গুঁড়া করিয়া কাফ্রিরা ময়দার মত খায়; ফলের শক্ত খোসা পাত্ররূপে ব্যবহার করে। কাণ্ডের আঁশগুলিও বিশেষ দরকারী, উহা হইতে কাগজের মণ্ড, রশি প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। এক একটি বাওবাব গাছ
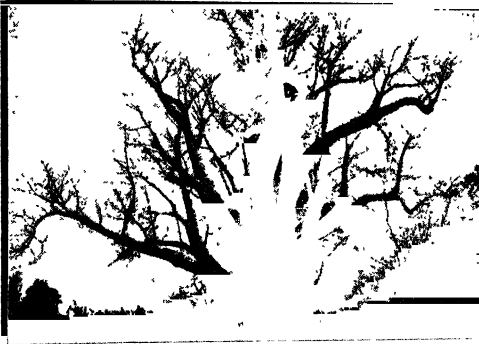
বাওবাব গাছ

৬০।৭০ হাত পর্য্যন্ত উঁচু হয়। উহাদের কাণ্ডও খুব মোটা। উহাদের তূলার মত শাদা ফুলগুলি দেখিতে সুন্দর; ফলগুলিও বেশ্ বড় বড়—এক একটা ১৪।১৫ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে।

বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা মারুঙ্গু সহরে পৌঁছিলাম। মারুঙ্গু ছোটখাট সুন্দর সহর—সমতল ভূমি হইতে প্রায় সোয়া মাইল উচ্চ স্থানে অবস্থিত। উহার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই

মনোরম। উহার পূর্ব্বদিকে যোজনের পর যোজন জুড়িয়া আফ্রিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত কিলিম্যানজারো তুষারময় উচ্চ শিখররাজি উন্নত করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান এবং পশ্চিমে **মাউণ্ট মেরু** নামক অনুন্নত পর্ব্বত—যেন কিলিম্যানজারোর গর্ব্বোন্নত শীর্ষশ্রেণী দেখিয়া বিষণ্নমনে ক্রমশঃ নতমুখ হইতে হইতে শেষে একেবারে **সিরেঙ্গটি প্রান্তরের** সহিত মিলিত হইয়াছে!

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সহরের পার্শ্ববর্ত্তী মুক্ত স্থানে বসিয়া আমরা প্রকৃতির যেই শোভা দেখিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই অপরূপ ও অনুপম।

অস্তগামী সূর্য্যের সোনালী কিরণমালা তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত-শৃঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। শৃঙ্গগুলি কখনও লাল, কখনও হরিৎ, আবার কখনও বা নীল—এইভাবে বিভিন্ন বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হইতেছিল; অথচ সেই রঙের কোনটাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতেছিল না। কোন্ ঐন্দ্রজালিকের যাদুস্পর্শে পর্ব্বতশীর্ষে ঐরূপ রঙের খেলা চলিতে-ছিল তাহা কে বলিবে?

নিবিষ্টমনে ঐ মনোহর দৃশ্য দেখিতেছিলাম, এমন সময় দুইজন শিকারী ও তাহাদের তিনজন কাফ্রি অনুচর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুচরদের দুইজনের হাতে ছিল দুইটি ফ্র্যাঙ্কোলিন পাখী, আর অন্য জনের হাতে একটি গিনি ফাউল দেখা গেল। পাখীগুলির গায়ে তখনও চাপ চাপ রক্ত

লাগিয়া ছিল; দেখিয়া মনে হইল অল্পক্ষণ আগে উহাদিগকে বধ করা হইয়াছে।

সেই দেশে পশুপক্ষী শিকার করিবার পূর্ব্বে শিকারীদের লাইসেন্স লইতে হয়। যেই সব পশু বা পক্ষী আকারে ছোট এবং প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাদের জন্য

গিনি ফাউল

লাইসেন্স-খরচ কম এবং সিংহ, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি বড় বড় জানোয়ারের লাইসেন্স যে বেশি লাগে তাহা বলাই বাহুল্য।

পরদিন সকালে জলযোগের পর আমরা কিলিম্যানজারো পর্ব্বতের দিকে রওনা হইলাম। পথ সমতল নহে; তথাপি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা পর্ব্বতের পদমূলে অবস্থিত **মোশি** নামক স্থানে পৌঁছিলাম। মারুঙ্গু হইতে ঐ স্থানের ব্যবধান বোধ হয় পনের-ষোল মাইলের বেশি হইবে না।

মোশি একটি রেলওয়ে জংশন। সেখান হইতে তিনদিকে রেল লাইন গিয়াছে। এক শাখা পশ্চিমদিকে অরুশা পর্য্যন্ত, অপর শাখা পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া, কেনিয়া-উগাণ্ডা রেলওয়ের মেইন লাইনে অবস্থিত ভোই ষ্টেশন পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় শাখা

কিলিম্যানজারো পর্ব্বত

দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ভারত মহাসাগরের কূলে অবস্থিত ট্যাঙ্গানিকা দেশের অন্যতম প্রধান নগর ও বন্দর **টঙ্গা** পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মোশি হইতে ক্রমোন্নত পার্ব্বত্য পথে যতদূর মোটর চালানো যায় সেই পর্য্যন্ত আমরা চলিলাম এবং সমতল

ভূ-ভাগ হইতে প্রায় তিনপোয়া মাইল উন্নত **মরাঙ্গা** নামক স্থানে পৌঁছিলাম। সেখানে সুন্দর একটি হোটেল আছে।

খচ্চর অথবা গাধার পিঠে চড়িয়া পর্ব্বতের আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিতে পারা যায়। সুখনের ইচ্ছা ছিল সেই ভাবে পর্ব্বতারোহণ করে, কিন্তু আমি রাজি হইলাম না বলিয়া তাহাকে নিরস্ত হইতে হইল।

পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রায় সোয়া মাইলের পর গভীর বন; তাহাতে নানা জাতীয় গাছ আকাশে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান। ঐ বনপ্রদেশের বিস্তারও প্রায় এক মাইল। তার পর পর্ব্বতগাত্র বড় বড় সবুজ তৃণগুল্মে আচ্ছাদিত। আরও উপরে শ্লেট-জাতীয় কালো পাথরের স্তর এবং তারও পরে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত কেবলই শাদা তুষারের রাজত্ব। দূর হইতে মনে হয় পর্ব্বতরাজ যেন ত্রিবর্ণরঞ্জিত সুবিশাল আবরণে আপন দেহ আবৃত করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন!

কিলিম্যানজারো আফ্রিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম পর্ব্বত একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে; 'কিবু' নামক উহার প্রধান শৃঙ্গের উচ্চতা ১৯,৭১০ ফুট অর্থাৎ প্রায় পৌনে চারি মাইল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কিলিম্যানজারো প্রথম আবিষ্কৃত হয়। তারও চল্লিশ বৎসর পরে—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রফেসার হেন্‌স্ মেয়ার (Prof. Hans Meyer) নামক জনৈক সাহেব একজন সহচর সহ নানা রকম বিপদ্-আপদ্ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের

শীর্ষদেশে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার পরে আরও অনেকের সেই সৌভাগ্য ঘটিয়াছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দুইজন জার্ম্মাণ, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কেপ-টাউনের জনৈক সাহেব, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মিস্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড নামক জনৈক ইংরেজ মহিলা এবং আরও এক বৎসর পরে তিনজন ইংরেজ যুবক পর্ব্বতের উচ্চতম প্রদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন।

পর্ব্বতের দিকে একমনে তাকাইয়া ছিলাম, এমন সময়ে

কাফ্রিরা বর্শা উঁচু করিয়া দৌড়াইতেছে

কয়েকটি হরিণ আমাদের খুব নিকট দিয়া তীর-বেগে দৌড়াইয়া গেল। তাহাদের পিছনে পিছনে কয়েকজন কাফ্রি বর্শা

উঁচু করিয়া—বিকট শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইতেছিল।
তাহাদের পিছনে—একটু দূরে ছিলেন একজন শিকারী সাহেব।

হরিণগুলি চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল ; হরিণের সঙ্গে দৌড়াইবার শক্তি মানুষের আছে কি ? কিন্তু আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার একটু নীচে—একটা অগভীর গুহার মুখে একটা বিচিত্রবর্ণের হরিণ হঠাৎ মুখ থুবড়িয়া ঘুরিয়া পড়িল। বুঝিলাম হরিণটি শিকারীর গুলীতে আহত হইয়াছে।

বঙ্গো হরিণ

হরিণটির নিকটে যাইয়া দেখিলাম, তাহার বুকের পাশ দিয়া তখনও রক্ত বাহির হইতেছে এবং চোখের কোণ বাহিয়া অবিরল

ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। হরিণটি দেখিতে খুব সুন্দর। উহার সারা গায়ে ডোরা-কাটা, শিং দুইখানি বেশ্ লম্বা। ঐ জাতীয় হরিণের নাম বঙ্গো হরিণ।

বঙ্গো হরিণ সচরাচর দেখা যায় না। একমাত্র আফ্রিকার উচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চলে উহারা বিচরণ করে। উহাদের বংশ নাকি প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। শিকারীদের অত্যাচারে দুনিয়ার অনেক প্রাণী লোপ পাইয়াছে। হয়ত এমন এক সময় আসিবে যখন উক্ত বঙ্গো হরিণও সেই ভাবে লোপ পাইবে।

যেই শিকারী বঙ্গো হরিণ শিকার করিয়াছিলেন, বৈকাল-বেলা তাঁহার সহিত পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ হইল। সুখন তাঁহার সহিত আলাপ জমাইয়া লইল। নানা কথাবার্ত্তার পর সাহেব বলিলেন যে, সিরেঙ্গটি প্রান্তরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত **ঙ্গোরোঙ্গোরো** নামক নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরিটি বাস্তবিকই দেখিবার মত জিনিষ। ঐ পর্ব্বত কোন্ স্মরণাতীত কালে নিবিয়া গিয়াছে তাহা কে জানে? এখন উহার সুবিশাল গহ্বরের মধ্যে আছে নানা জাতীয় বড় বড় গাছ, আর তাহাদের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে মোটা মোটা লতা; সেই বৃক্ষলতায় পূর্ণ ঘন বনের মধ্যে বিচরণ করে বড় বড় হিংস্র জানোয়ার!

পৃথিবীর মধ্যে ঙ্গোরোঙ্গোরোর মত বিশাল মুখ বিশিষ্ট আগ্নেয় গিরি আর নাই। উহার পরিধি অন্যূন ৩৫ মাইল এবং

ব্যাস ১২ মাইলেরও বেশি। গহ্বরের গা ঘেঁসিয়া মোটর চালাইয়া ক্রমশঃ ঘূরিয়া ঘূরিয়া নীচের দিকে যাওয়া যায় এবং হিংস্র জানোয়ারদের আস্তানা পর্য্যবেক্ষণ করা যায়।

শুনিয়া সুখনের একবার ঙ্গোরোঙ্গোরোর দিকে যাওয়ার ইচ্ছা হইল, কিন্তু ড্রাইভারের শরীর বিশেষ ভাল ছিল না। কাজেই রাত্রিটা মোশি সহরে কাটাইয়া পরদিন সকালে আমরা যাত্রা করিলাম অরুশার দিকে।

ক্রমাগত চলিতে চলিতে প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে আমরা ডুলুটি হ্রদের তীরবর্ত্তী হইলাম। মাউণ্ট মেরুর ঢালু পার্শ্বে ঐ হ্রদটি অবস্থিত। হ্রদটি ছোট হইলেও বেশ সুন্দর। হ্রদের তীরে মোটর থামাইয়া দুই-তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করা গেল।

ঐ সময়ে কয়েকটি কাফ্রি ছেলেমেয়ে আমাদের মোটরের আশে পাশে ঘূরাফেরা করিতেছিল; দুই-একটি খুব কাছে আসিয়া আমাদের জিনিষপত্র দেখিতেছিল এবং বারংবার সবিস্ময়ে আমাদের দিকে চাহিতেছিল। সেখান হইতে রওনা হইয়া বৈকালবেলা অরুশা সহরে পৌঁছিলাম।

তার পরদিন আমরা পুনরায় নাইরোবির দিকে রওনা হইলাম। ডাইনদিকে মাউণ্ট মেরু, আর বামদিকে সিরেঙ্গটি প্রান্তর; এই দুইয়ের মধ্য দিয়া আমাদের মোটর ছুটিয়া চলিল।

সিরেঙ্গটি প্রান্তর ভীষণ স্থান। বহু যোজন বিস্তৃত প্রান্তর —নল-খাগড়া জাতীয় লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা। তাহার ভিতরে

সিংহ, হরিণ প্রভৃতি দলে দলে বিচরণ করে। আবার যেখানে ঘাস বিরল, সেখানে মাসাই কাফ্রিরা গৃহপালিত পশু চরাইয়া থাকে। সময় সময় ঐ সব পশুপালের উপর পশুরাজেরা নেকনজর দিতে কসুর করে না; কিন্তু যাহারা সেই অঞ্চলে

কাফ্রি মেয়ে

বাস করে তাহাদের সাহস ত আর কম নয়—সামান্য একটা বর্শা হাতে লইয়াও তাহারা পশুরাজকে পগারপার করিয়া দেয়।

সেইদিন সকালবেলা হইতেই ঘন কুয়াশা ছিল—বেলা

বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেও চারিদিক তেমন ফর্সা হয় নাই। অরুশা হইতে রওনা হওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে প্রাণটা দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। চকিতে বামদিকে চাহিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম; দেখিলাম ছয়-সাতটি সিংহ—সাক্ষাৎ যমের মত—আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। কি ভীষণ

সিরেঙ্গটি প্রান্তরের সিংহ

তাদের দৃষ্টি—কি ভয়ঙ্কর তাদের গর্জ্জন! তাদের কথা মনে হইলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

যা হউক, ড্রাইভার খুব জোরে গাড়ী চালাইয়া দিল এবং ক্রমশঃ চলিতে চলিতে নমাঙ্গা সহর পিছনে ফেলিয়া, সন্ধ্যার একটু পরে, আমরা কাজিয়াডো সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সেই রাত্র সেখানে থাকিয়া, পরদিন সকালে দশটার মধ্যে, আমরা নাইরোবি সহরে ফিরিয়া আসিলাম।

পনের

স্বদেশে

মাসাইদের দেশ হইতে ফিরিবার পর, দেখিতে দেখিতে একটি মাস কাটিয়া গেল—দেশে ফিরিবার সময় হইল। মনে করিয়াছিলাম, সুখন সহ বেশ্ স্ফূর্ত্তিতে দেশে ফিরিব; কিন্তু সুখনের বাবা আপত্তি করায় সে আমার সঙ্গী হইতে পারিল না। আমাকে একাকী রওনা হইতে হইল।

নাইরোবি হইতে মোম্বাসা-গামী ট্রেন ছাড়ে বৈকালে। বেলা সাড়ে তিনটার সময় মামাবাবু ও মামীমার আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া ভাই দুইটিকে স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইয়া, আমি স্বদেশ-যাত্রা করিলাম। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব সহ সুখন এবং মামাবাবুর বাসার প্রায় সকলে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সুখন অত্যন্ত দুঃখের সহিত ছল-ছল চোখে আমাকে বিদায় দিল। সুখনের ন্যায় বন্ধুর ভালবাসা ও মামা-মামীর স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া আসিতে আমারও খুবই কষ্ট হইতেছিল। আমাকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া, ভাই দুইটি ত কাঁদিয়াই ফেলিল—মামীমাও কাপড়ের আঁচল দিয়া বারংবার চোখ মুছিতেছিলেন।

গাড়ীতে ও ষ্টীমারে খুব সাবধানে থাকিবার জন্য মামাবাবু

অনেক উপদেশ দিলেন। বেলা সোয়া চারিটার সময়, ট্রেন হুস্ হুস্ শব্দে মোম্বাসার দিকে রওনা হইল।

একাকী রওনা হওয়ায় মনে শান্তি ছিল না মোটেই। গাড়ীতে নিজের জিনিষপত্রগুলি গুছাইয়া রাখিয়া, জানালার পাশে গিয়া বসিলাম। প্রকৃতির বিচিত্র লীলা-নিকেতনের অপূর্ব্ব শোভা শেষবারের মত প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কোঞ্জা জংশনের পর উল্লু
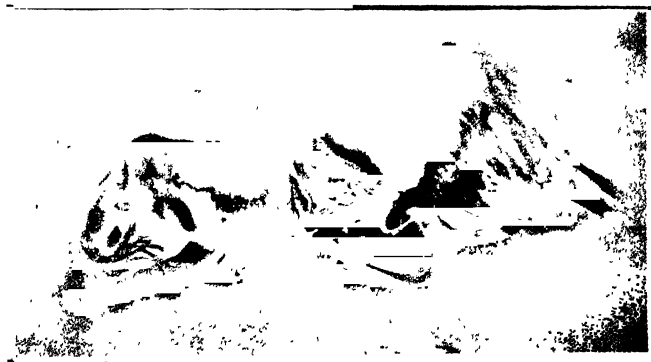
'নূ'-র লড়াই

ও কিউ ষ্টেশনের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে—গাড়ীর ডাইন পাশে সেই সান্ধ্য আলোকে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিলাম দুইটি বড় বড় নূ প্রাণপণে লড়াই করিতেছে। স্থানটি বালি-কঙ্করময়। উহাদের পায়ের অনেকখানি বালির ভিতর

ঢুকিয়া গিয়াছে, তথাপি লড়াই-এর উন্মাদনায় দিশাহারা প্রাণী দুইটি ক্ষান্ত হইতেছে না ! আমাদের দেশে মাঝে মাঝে ষাঁড়ের লড়াই দেখা যায়, নূ-গুলি ঠিক সেই ভাবেই লড়িতেছিল।

সাঁঝের আঁধার ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু খাবার খাইয়া, শুইয়া পড়িলাম। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, গাড়ী অধিত্যকা অঞ্চল ছাড়িয়া—সমতল প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছে ! ইতস্ততঃ আম, নারিকেল ও পাম গাছ দেখা যাইতেছিল।

বেলা প্রায় সোয়া আটটার সময় মোম্বাসা ব্রীজের উপর দিয়া মুহুর্মুহুঃ বংশীধ্বনি করিতে করিতে ট্রেন মোম্বাসা ষ্টেশনের দিকে চলিল এবং একটা মোড় ঘুরিয়া, সোজা দক্ষিণদিকে চলিয়া সাত-আট মিনিটের মধ্যেই প্ল্যাটফরমে গিয়া থামিল।

যাত্রীরা একে একে নামিয়া পড়িল। আমিও নামিলাম। নামিয়া হোটেলের দিকে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় দেখিলাম, এল্‌গন পাহাড় দর্শনের সময় নরদেববাবু নামে যে ভদ্রলোক আমাদের সহযাত্রী ছিলেন, তিনিও পাশের একটা কামরা হইতে নামিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া খুব আনন্দ হইল ; তাড়াতাড়ি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনিও আমাকে দেখিয়া খুব খুশী হইলেন এবং সাগ্রহে করমর্দ্দন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, নরদেববাবুও স্বদেশে

রওনা হইয়াছেন। পরিচিত বন্ধুকে ভ্রমণের সাথী পাইয়া, আমার মনমরা ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল।

তার পরদিন বোম্বাইর ষ্টীমার ছাড়িবার কথা। কাজেই সহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া সেই দিনটা কাটাইয়া দিলাম। বৈকালে জেটির ধারে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম, জোয়ারের জল নামিয়া যাওয়াতে সাদা বালুকাময় সৈকতে বহুসংখ্যক ছোট ছোট মাছ ও একজাতীয় স্বচ্ছ কাঁকড়া পড়িয়া আছে।

আরও খানিকটা উত্তরদিকে যাইয়া দেখিলাম, একস্থানে

গজদন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান—মোম্বাসা

সাহেব, কাফ্রি ও আমাদের স্বদেশী লোক অনেকে জড় হইয়াছে। তাহাদের নিকটে গিয়া দেখিলাম, সেখানে হাতীর দাঁত

ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে। কাফ্রি-মুল্লুকের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত বড় বড় গজদন্ত সেখান হইতে ষ্টীমার বোঝাই হইয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়।

পরদিন ঠিক সময়ে আমরা ষ্টীমারে উঠিলাম। গাঢ় কালো ধূম উদ্গিরণ করিয়া—বিকট বংশীধ্বনি করিতে করিতে বিরাট অর্ণবযান বিশাল ভারত মহাসাগর পাড়ি দিতে যাত্রা করিল। গল্‌ফ-কোর্স ও লাইট্-হাউসের পাশ দিয়া চলিয়া ষ্টীমার সমুদ্রের বুকে আসিয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরেই কাফ্রি-মুল্লুকের শেষ দৃশ্যও দিগন্তে মিলাইয়া গেল—আমরা স্বদেশের দিকে চলিলাম।

*　　　*　　　*

যথাসময়ে আমরা বোম্বাই সহরে পৌঁছিলাম। নরদেববাবু নিজের কোন কাজের জন্য কয়েকদিন সেখানে থাকিতে মনস্থ করিলেন। আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।……

তারপর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি কাফ্রি-মুল্লুকের স্মৃতি ভুলিতে পারি নাই। সেই বিচিত্র দেশের নিত্য-নূতন সৌন্দর্য্যে আমি এতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, তাহাদের কথা স্মরণপথে উদিত হইলেই পুনরায় সেই সব সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনের কোণে জাগিয়া উঠে।

—শেষ—